শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

সাধনার দ্বিতীয় চারি বৎসর)

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন।

সময়—সন ১২৬৮ সাল হইতে ১২৭১ সাল, ইংরাজী ১৮৬১

খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ।

ঠাকুরের বয়স—২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯ বৎসর।

বিবাহ করিয়া কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পরে সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে, ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরের জীবনে দুইটি ঘটনা সমুপস্থিত হয়। ঘটনা দুইটি তাঁহার জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছিল; সেজন্য উহাদের কথাই আমরা এখন পাঠককে বলিব। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রাণী রাসমণি গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হন। ঠাকুরের শ্রীমুখে আমাদের কেহ কেহ শুনিয়াছেন, রাণী ঐ সময়ে একদিন সহসা পড়িয়া যান। উহাতেই জ্বর, গাত্রবেদনা ও অজীর্ণাদির সূত্রপাত হইয়া, ক্রমে গ্রহণীরোগের সঞ্চার হয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি, অশেষ গুণবতী রাণী সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ৩১শে তারিখে বৃহস্পতিবারে দক্ষিণেশ্বরকালীবাটী সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং ঐ দেবসেবা আবহমান কাল নির্বিঘ্নে চালাইবার উদ্দেশ্যে ঐ বৎসর ১৪ই ভাদ্র, ইংরাজী ২৯শে আগষ্ট তারিখে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তিন লাট জমিদারী দুই লক্ষ ছাব্বিশ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছিলেন।* মনে মনে সঙ্কল্প থাকিলেও, কিন্তু রাণী এতদিন

---

* Plaint in Suit No. 308 of 1872 Puddomoni Dasee vs. Jagadamba Dasee, recites the following from the Deed of

ঐ সম্পত্তি আইনানুসারে যথাযথ ভাবে দানপত্র-লিপিবদ্ধ ক উহাকে দেবোত্তররূপে পরিণত করেন নাই। আসন্নকাল উপ দেখিয়া উহা করিবার জন্য তিনি এখন ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাণ চারি কন্যার মধ্যে মধ্যমা ও তৃতীয়া শ্রীমতী কুমারী ও শ্রীমতী করুণাময়ী দাসীর দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে সুতরাং তাঁহার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যাদ্বয়, শ্রীমতী পদ্মমণি ও শ্রীমতী জগদম্বা দাসীই উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়াছি, কালীবাটীর দেবোত্তর, দানপত্র রাণীর অভিপ্রায়ানুসারে প্রস্তুত হইয়া আসিলে, উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে ঐ সম্পত্তির নিয়োগ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিবাদ, বিসম্বাদের পথ এককালে রুদ্ধ করিবার জন্য রাণী নিজ কন্যাদ্বয়কে সম্মতিসূচক অঙ্গীকারপত্রে সহি করিতে বলিয়াছিলেন। কনিষ্ঠা শ্রীমতী জগদম্বা ঐ পত্রে সহি করিয়াছিলেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী পদ্মমণি রাণীর মৃত্যুকালীন অনুরোধেও উহাতে সহি করেন নাই। সেজন্য মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও রাণী শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। অগত্যা, ৺জগদম্বার ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে, ভাবিয়া, রাণী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেবোত্তর দানপত্রে স্বয়ং সহি করিলেন * এবং ঐ

Endowment executed by Rani Rasmoni :- "According to my late husband's desire * * * I on 18th. Jaistha 1262 B. S. (June 1855) established and consecrated the Thakurs * * * and for purpose of carrying on the Sheba purchased three lots of Zemindaries in District Dinajpur on 14th. Bhadra 1262 B. S. (29th. August 1855) for Rs. 2,26,000."

* Deed of Endowment dated 18th. February 1861 executed by Rani Rasmoni and acknowledged her execution before J. F. Watkins, Solicitors, Calcutta. This dedication was accepted as valid by all parties in Alipore Suit No. 47 of 1867, Jadu Nath Chowdhury vs. Puddomoni, and in the High Court Suit No. 308 of 1872 Puddomoni vs. Jagadamba and also when that Suit (No. 308) was revived after contest on 19th. July 1888.

শ্রাদ্ধ সমাধা করিবার পর দিনে, ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রিকালে শরীর ত্যাগ করিয়া ৺দেবীলোকে গমন করিলেন।

ঠাকুর বলিতেন, শরীরত্যাগের কিছু দিন পূর্ব্বে রাণী রাসমণি ৺কালীঘাটে আদিগঙ্গা তীরস্থ বাটীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন; এবং দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বকালে, সম্মুখে অনেকগুলি আলোক জ্বালা হইয়াছে দেখিয়া, সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ও সব রোস্‌নাই আর ভাল লাগ্‌ছে না, এখন আমার মা (শ্রীশ্রীজগন্মাতা) আস্‌ছেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারিদিক্ আলোকময় হ'য়ে উঠেছে!" (কিছুক্ষণ পরে) "মা এলে! পদ্ম যে সহি দিলে না—কি হবে মা!"—তাঁহাকে তখন গঙ্গাগর্ভে আনয়ন করা হইয়াছিল, এবং নিকটেই চতুর্দ্দিকে শিবাকুলের উচ্চ নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছিল! ঐ কথাগুলি বলিয়াই পুণ্যবতী রাণী স্থির শান্তভাবে মাতৃক্রোড়ে মহাসমাধিতে শয়ন করিলেন!

কালীবাটীর দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়া রাণী রাসমণির দৌহিত্রগণের মধ্যে উত্তরকালে যে বহুল বিবাদ-বিসম্বাদ ও মকদ্দমা চলিতেছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়—তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্না রাণী, তাঁহার প্রাণস্বরূপ দেবীসেবার বন্দোবস্ত যথাযথ থাকিবে না বলিয়া, মৃত্যুকালে কেন অত আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং কেনই বা সাংঘাতিক ব্যাধির যন্ত্রণাপেক্ষা ঐ চিন্তার যন্ত্রণা তাঁহার নিকট তীব্রতর বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। আদালতের কাগজ পত্রে দেখা যায়, ঐ সকল মকদ্দমার বহুল ব্যয়ের জন্য ঐ দেবোত্তর সম্পত্তি ঋণগ্রস্ত হইয়া এখনই কিঞ্চিন্ন্যূন লক্ষ মুদ্রায় বাঁধা পড়িয়াছে।* কে বলিবে, রাণী রাসমণির অদ্বিতীয় দৈবকীর্ত্তি ঐ বিবাদের ফলে নাম মাত্রে পর্য্যবসিত এবং ক্রমে লুপ্ত হইবে কি না!

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী প্রতিষ্ঠার কালে রাণীর কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুত

* Debt due on mortgage by the Estate is Rs. 50,000; interest payable quarterly is Rs. 876—0—0; Costs of the Referee already stated to amounto to Rs. 20,000—0— as yet untaxed.

মথুরানাথ বা মথুরামোহন বিশ্বাস বিষয়-সংক্রান্ত সকল কার্য্য পরিচ তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কালীবাটী প্রতিষ্ঠা হইতে তিনিই উহার দেবোত্তর সম্পত্তির আয় ব্যয় বুঝিয়া রাণীর ইচ্ছা দেবসেবা-সংক্রান্ত সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। সুতরা রাণীর মৃত্যুর পরে তিনিই উহা পূর্ব্বের ন্যায় পরিচালনা করিতে থাকি-লেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র জীবন-প্রভাব মথুরানাথের মনের উপর ইতিপূর্ব্বেই অধিকার বিস্তৃত করায়, দক্ষিণেশ্বরের মাতৃসেবা যে রাণীর মৃত্যুতে কোন অংশে হীনাঙ্গসম্পন্ন হইল না, একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ঠাকুরের সহিত মথুরামোহন বা মথুরানাথের বিচিত্র সম্বন্ধের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাঠককে অনেকবার বলিয়াছি। অতএব এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই চলিবে যে, দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধন-সমূহ ঠাকুরের জীবনে যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই রাণী রাসমণির স্বর্গারোহণ ও কালীবাটী-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে মথুরানাথের একাধিপত্য-লাভরূপ ঘটনা উপস্থিত হওয়ায়, বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে সম্যক্ সহায়তা করিবার বিশেষ অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার অঙ্গুলী-সঙ্কেতে মথুরের এই সময়ে বিষয়াধিকার লাভ ঠাকুরকে সহায়তা করিবার জন্যই কি না, তাহা কে বলিতে পারে? কারণ, দেখা যায়, এখন হইতে আমরণ মথুরানাথ ঠাকুরের বিশেষভাবে সেবা করিতেই আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। বিষয়াধিকার লাভের পর দীর্ঘ দশ বৎসরেরও অধিক কাল ঐরূপে এক ব্যক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া উচ্চ ভাবাশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করা একমাত্র ঈশ্বরকৃপাতেই সম্ভব হইতে পারে। রাণীর বিপুল বিষয়ে প্রায় একাধিপত্য লাভ করিয়া, মথুরানাথ যে উচ্ছৃঙ্খল ও বিপথগামী না হইয়া ঠাকুরের প্রতি দিন দিন অধিকতর বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাতেই পূর্ব্বোক্ত কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বিশিষ্ট সাধকভক্ত ভিন্ন অন্য কেহই এখনও পর্য্যন্ত ঠাকুরের উচ্চাবস্থা সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা করিতে পারে নাই! মানব-সাধারণ তাঁহাকে

বিকৃতমস্তিষ্ক উন্মাদ বলিয়াই ধারণা করিয়াছিল। তবে বুঝিয়াছিল যে, এ উন্মাদ আপনার হিতাহিত কিছুমাত্র বুঝে না, রূপরসাদি কোন বিষয়েই আকৃষ্ট হয় না, কখন কাহারও অনিষ্টচেষ্টা করে না এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া ইচ্ছামত কখন 'হরি' কখন 'রাম' এবং কখন বা 'কালী কালী' বলিয়া দিন কাটাইয়া দেয়! বুঝিয়াছিল যে, যে রাণী রাসমণির ও মথুর বাবুর কৃপা প্রাপ্ত হইলে লোকে আপন গণ্ডা বেশ গুছাইয়া লয়, ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সুনয়নে পড়িয়াও এ উন্মাদ আপনার সাংসারিক উন্নতির কিছুই করিয়া লইতে পারে নাই—কখন পারিবে যে, সে সম্ভাবনাও নাই। আর বুঝিয়াছিল যে, সর্ব্বথা অকর্ম্মণ্য হইলেও এ উন্মাদের উজ্জ্বল নয়নে, অদৃষ্টপূর্ব্ব চালচলনে, মধুর কণ্ঠস্বরে, সুললিত বাক্য-বিন্যাসে এবং কখন কখন প্রকাশিত অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এমন একটা কি আকর্ষণ আছে, যাহাতে, তাহারা যে সকল ধনী মানী ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে অগ্রসর হইতেও সঙ্কোচ বোধ করে, সে সকল লোকের সম্মুখে এ উন্মাদ কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া উপস্থিত হইলেও অচিরে তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠে! ইতর সাধারণ মানব এবং কালীবাটীর কর্ম্মচারীরা ঐরূপ ভাবিলেও, মথুর বাবু কিন্তু অন্যরূপ ভাবিতেন। হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি—মথুরানাথ বলিতেন, (ঠাকুরের উপর) "শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপা হইয়াছে বলিয়াই, উঁহার ঐ প্রকার উন্মত্তবৎ ভাব উপস্থিত হইয়াছে।"

সে যাহা হউক, রাণী রাসমণির মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে ঠাকুরের জীবনে ঐ বৎসর আর একটি বিশেষ ঘটনা সমুপস্থিত হয়। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর পশ্চিম ভাগে গঙ্গাতীরে সুবৃহৎ পোস্তার উপরেই বিচিত্র পুষ্পকানন ছিল। সযত্ন-রক্ষিত ঐ কাননে তখন নানাজাতীয় পুষ্প-সম্ভার মস্তকে বহন করিয়া বৃক্ষলতাদি বিচিত্র শোভা বিস্তার করিত এবং মধুগন্ধে দিক্ আমোদিত হইত। শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা না করিলেও, ঠাকুর ঐ কালে নিত্য ঐ কানন হইতে পুষ্প চয়ন করিতেন এবং মালা রচনা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে স্বহস্তে সাজাইতেন। ঐ কাননের দক্ষিণে, গঙ্গাগর্ভ হইতে মন্দিরে যাইবার চাঁদনী-শোভিত বিস্তৃত সোপানাবলী এবং উত্তরে, পোস্তার শেষে স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারের

জন্য একটি ক্ষুদ্র বাঁধাঘাট ও কালীবাটীর উত্তরের নহবৎখানা অদ্য বর্ত্তমান। বাঁধা ঘাটটির উপরে একটি বৃহৎ বকুল বৃক্ষ বিদ্যমান থাকায়, লোকে উহাকে বকুলতলার ঘাট বলিয়া নির্দ্দেশ করিত।

পূর্ব্বোক্ত কাননে ঠাকুর একদিন প্রাতে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে একখানি নৌকা বকুলতলার ঘাটে আসিয়া লাগিল এবং উহা হইতে গৈরিকবস্ত্র-পরিহিতা, আলুলায়িত-দীর্ঘ-কেশা, ভৈরবীবেশ-ধারিণী এক সুন্দরী রমণী পুস্তকাদির একটি পুঁটুলি হস্তে অবতরণ করিয়া, দক্ষিণের সুবৃহৎ ঘাটের চাঁদনীর দিকে অগ্রসর হইলেন। যৌবনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যাভাস তাঁহার শরীরকে তখনও ত্যাগ না করায়, প্রৌঢ়বয়স্কা হইলেও, ভৈরবীকে দেখিয়া তাহা কেহই মনে করিতে পারিত না। কিন্তু ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ভৈরবীর বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি হইবে। ভৈরবীর সহিত নিজ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা ঠাকুর প্রথম দর্শনে কতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আপনার লোক দেখিলে লোকে যে বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকে, ভৈরবীকে দেখিয়াই তিনি যে উহা অনুভব করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য। কারণ, ভৈরবীকে দূর হইতে দেখিয়াই ঠাকুর স্বগৃহে ফিরিলেন এবং ভাগিনেয় হৃদয়কে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ চাঁদনী হইতে উক্ত সন্ন্যাসিনীকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। শুনিয়াছি, হৃদয় তাঁহার ঐরূপ আদেশ পালনে ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছিল, "রমণী অপরিচিতা, ডাকিলেই আসিবে কেন?"—ঠাকুর তদুত্তরে বলেন, "আমার নাম ক'রে বল্‌গে যা, তা হ'লেই আস্‌বে এখন।" হৃদয় বলিত, অপরিচিতা সন্ন্যাসিনীর সহিত আলাপ করিবার জন্য মাতুলের ঐরূপ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সে অবাক্ হইয়াছিল। কারণ, ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে ঐরূপ করিতে সে আর কখনও দেখে নাই।

সে যাহা হউক, উন্মাদ মাতুলের বাক্যের অন্যথা করিবার উপায় নাই বুঝিয়া, হৃদয় চাঁদনীতে যাইয়া দেখিল, ভৈরবী ঐ স্থানেই উপবিষ্টা রহিয়াছেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, তাহার ঈশ্বরভক্ত মাতুল তাঁহার দর্শনলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ঐকথা শুনিয়া

ভৈরবী মনে কোন দ্বিধা বোধ বা প্রশ্নান্তর না করিয়াই, তাহার সহিত আগমনের জন্য উঠিলেন দেখিয়া, হৃদয় অধিকতর বিস্মিত হইল।

ঠাকুরের ঘরে আসিয়া ও তাঁহাকে দেখিয়াই ভৈরবী সহসা আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূতা হইলেন এবং বাষ্পবারি মোচন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, তুমি এখানে রয়েছ! তুমি গঙ্গাতীরে আছ জেনে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, এতদিনে দেখা পেলাম্!" ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার কথা কেমন ক'রে জান্‌তে পার্‌লে মা?" ভৈরবী বলিলেন,—"তোমাদের তিন জনের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে হবে, এ কথা জগদম্বার কৃপায় পূর্ব্বে জান্‌তে পেরেছিলাম। দুই জনের দেখা *পূর্ব্ব (বঙ্গ) দেশে পেয়েছি, আজ এখানে তোমার দেখাও পেলাম্!"*

ঠাকুর তখন ভৈরবীর নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, বালক যেমন জননীর নিকটে সকল কথা সানন্দে বলিতে থাকে, সেই ভাবে আপন অদৃষ্টপূর্ব্ব দর্শনের কথা, ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়া, গাত্রদাহ, নিদ্রাশূন্যতা প্রভৃতি যোগজ শারীরিক বিকারের কথা, লোকে তাঁহাকে যেজন্য উন্মাদ বলিয়া ধারণা করিয়াছে প্রভৃতি সকল কথা—তাঁহাকে মন খুলিয়া বলিতে ও পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"হ্যাঁগা আমার এ সকল কি হয়?—আমি কি সত্যই পাগল হ'লুম?—মাকে (জগদম্বাকে) মনে প্রাণে ডেকে সত্যই কি আমার কঠিন ব্যাধি হ'ল?"— ভৈরবীও ঠাকুরের ঐ কথা শুনিতে শুনিতে জননীর ন্যায় কখন উত্তেজিতা, কখনও উল্লসিতা, এবং কখনও বা করুণার্দ্র-হৃদয়া হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের জন্য বলিয়া উঠিলেন—"তোমায় কে পাগল বলে, বাবা? তোমার এ ত পাগলামি নয়; তোমার এ যে মহাভাব হ'য়েছে, তাই ঐরূপ হচ্চে! তোমার যা (আধ্যাত্মিক অবস্থা) হ'য়েছে, তা কি কাহারও চিনিবার সাধ্য আছে? তাই ঐ প্রকার বলে। ঐ রকম হ'য়েছিল শ্রীমতী রাধারাণীর; ঐ রকম হ'য়েছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর! সে সব কথা (ভক্তি) শাস্ত্রে আছে। আমার নিকটেই এই সব পুঁথি (শাস্ত্রগ্রন্থ) র'য়েছে। আমি তোমাকে প'ড়ে শুনাব; দেখাব যে, ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক যারাই ডেকেছে, তাদেরই ঐরূপ অবস্থা সব হ'য়েছে

ও হয়।"—ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও নিজ মাতুলকে ঐরূপে পূর্ব্বপরি… পরমাত্মীয়ের ন্যায় বাক্যালাপ ও ব্যবহারাদি করিতে দেখিয়া, হৃদয়ে বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

অনন্তর কথায় কথায় বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া, ঠাকুর দেবীর প্রসাদ ফল, মূল, মাখন, মিছরি প্রভৃতি ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে জলযোগ করিতে দিলেন এবং মাতৃভাবে ভাবিতা ব্রাহ্মণী পুত্রস্বরূপ তাঁহাকে পূর্ব্বে না খাওয়াইয়া জলগ্রহণ করিবেন না বুঝিয়া, স্বয়ং ঐ সকল খাদ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন। দেবদর্শন ও জলযোগ শেষ হইলে, ব্রাহ্মণী নিজ কণ্ঠগত রঘুবীর শিলার ভোগের জন্য ঠাকুরবাটীর ভাণ্ডার হইতে আটা ময়দা প্রভৃতির সিধা গ্রহণ করিয়া, পঞ্চবটীতলে রন্ধনাদিতে ব্যাপৃতা হইলেন।

অনন্তর রন্ধন শেষ হইলে, ৺রঘুবীরের সম্মুখে খাদ্যাদি রাখিয়া, ব্রাহ্মণী নিবেদন করিয়া দিলেন এবং ইষ্টদেবকে চিন্তা করিতে করিতে গভীর ধ্যানে নিমগ্না হইয়া, অভূতপূর্ব্ব দর্শনলাভে সমাধিস্থা হইলেন! তাঁহার দুনয়নে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তিনি বাহ্যজ্ঞান এককালে হারাইয়া ফেলিলেন! ঠাকুরও ঐ সময়ে পঞ্চবটীতে আসিবার জন্য প্রাণে প্রাণে আকর্ষণানুভব করিয়া, ভাবাবেশে সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায়, কি করিতেছেন সম্যক্ না বুঝিয়া, অপরের শক্তিবলে প্রযুক্ত নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় ব্রাহ্মণী-নিবেদিত সম্মুখস্থ খাদ্য সকল গ্রহণ করিতে থাকিলেন! কতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ প্রকার কার্য্যকলাপ দেখিয়া এবং নিজ দর্শনের সহিত উহা মিলাইয়া পাইয়া, বিস্ময়ে আনন্দে কণ্টকিত-কলেবরা হইলেন! আবার কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর যখন সাধারণ জ্ঞানভূমিতে অবরোহণ করিয়া. নিজকৃত কার্য্যের জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিতে লাগিলেন, "কে জানে বাবু, কেন এমন বেসামাল হইয়া এইরূপ কার্য্য সকল করিয়া বসি"—তখন ব্রাহ্মণী জননীর ন্যায় তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, "বেশ করিয়াছ বাবা; ঐ কাজ ত তুমি কর নাই, তোমার ভিতরে যিনি আছেন,

তিনিই করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন; ধ্যান করিতে করিতে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, কে ঐরূপ করিয়াছে এবং কেনই বা করিয়াছে; বুঝিয়াছি যে, আর আমার পূর্ব্বের ন্যায় পূজার আবশ্যকতা নাই, আমার পূজা করা এতদিনের পরে সার্থক হইয়াছে!"—এই বলিয়া ব্রাহ্মণী মনে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া, ঠাকুরের ভোজনাবশিষ্ট দেবপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে ৺রঘুবীরের জীবন্ত দর্শন স্থায়িভাবে লাভ করিয়া প্রেমগদ্গদ অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় বাষ্পবারি মোচন করিতে করিতে বহুকালের পূজিত রঘুবীর শিলাটিকে সযত্নে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত করিলেন!

প্রথম দর্শনের প্রীতি ও আকর্ষণ ঠাকুর ও ব্রাহ্মণীর মধ্যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অপত্যপ্রেমে মুগ্ধহৃদয়া সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্বরেই রহিয়া গেলেন। পরস্পরের দর্শন ও আধ্যাত্মিক বাক্যালাপে পঞ্চবটীতে দিনের পর দিন যে কোথা দিয়া যাইতে লাগিল, তদ্বিষয় উভয়ের মধ্যে কাহারও অনুভবে আসিল না! ঠাকুর নিজ আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থা সম্বন্ধীয় রহস্য কথা সকল অকপটে ব্রাহ্মণী মাতাকে বলিয়া সর্ব্বদা নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণী, নানা তন্ত্রগ্রন্থসমূহ হইতে ঐ সকলের সমাধান করিয়া এবং কখন বা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থসমূহ হইতে অবতার পুরুষের দেহমনে ঈশ্বরপ্রেমের প্রবল বেগ কিরূপ লক্ষণ সকলের আবির্ভাব করে, তদ্বিষয় পাঠ করিয়া শুনাইয়া, ঠাকুরের সংশয় সকল ছিন্ন করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটীতে ঐরূপে দিব্যানন্দের প্রবাহ ছুটিল।

ছয় সাত্ দিন ঐরূপে কাটিবার পর, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ঠাকুরের মনে হইল, দোষসম্পর্ক না থাকিলেও, ব্রাহ্মণীকে এখানে রাখা ভাল হইতেছে না। কামকাঞ্চনাসক্ত সংসারী মানব বুঝিতে না পারিয়া, পবিত্রা রমণীর চরিত্র-সম্বন্ধে নানা কথা রটনার অবসর পাইবে। মনে ঐ কথার উদয় হইবামাত্র তিনি ব্রাহ্মণীকে উহা ইঙ্গিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণীও মনে মনে উহার যাথার্থ্য অনুধাবন করিলেন এবং নিকটেই গ্রামমধ্যে কোন স্থানে থাকিয়া, প্রতিদিন দিবসে কিছু কালের জন্য আসিয়া ঠাকুরের সহিত

দেখা করিয়া যাইবার সংকল্প স্থির করিয়া, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী পরিত্যাগ করিলেন।

কালীবাটীর অনতিদূরে উত্তরে ভাগীরথীতীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামের মধ্যে দেবমণ্ডলের ঘাট—ব্রাহ্মণী এই স্থানে আসিয়া আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন * এবং গ্রামমধ্যে যথা তথা পরিভ্রমণ করিয়া, নিজগুণে গ্রামস্থ রমণীকুলের শীঘ্রই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। সুতরাং বাসস্থান ও ভিক্ষা কোন বিষয়েরই এখানে তাঁহার আর অসুবিধা রহিল না এবং লোকনিন্দার ভয়ে ঠাকুরের পবিত্র দর্শনলাভেও তাঁহাকে একদিনের জন্যও আর বঞ্চিত হইতে হইল না। তিনি প্রতিদিন কিয়ৎকালের জন্য কালীবাটীতে আসিয়া, ঠাকুরের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিয়া যাইতে লাগিলেন এবং গ্রামস্থ পরিচিত রমণীকুলের নিকট হইতে নানাপ্রকার খাদ্যাদি ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করিয়া, ঠাকুরকে ভোজন করাইতেও লাগিলেন।†

ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অনুভব, দর্শন ও অবস্থাদির কথা শুনিয়া, বিশিষ্ট সাধিকা ব্রাহ্মণীর নিশ্চিত ধারণা হইল—ঐ সকল অসাধারণ ঈশ্বরপ্রেম হইতে উপস্থিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বরালাপে ঠাকুরের মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধিতে বাহ্য চৈতন্যের লোপ ও কীর্ত্তনে পরমানন্দ দেখিয়া, তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল—ইনি সামান্য সাধক মাত্র নহেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতাদি গ্রন্থের স্থলে স্থলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরায় শরীর ধারণ করিয়া আগমনের কথার যে সকল ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়, ঠাকুরে‌কে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর

---

* হৃদয় বলিতেন, দেব মণ্ডলের ঘাটে থাকিবার পরামর্শ ঠাকুরই ব্রাহ্মণীকে প্রদান করিয়া, তাঁহাকে মণ্ডলদের বাটী পাঠাইয়া দেন এবং তথায় যাইবামাত্র ৺নবীনচন্দ্র নিয়োগীর ধর্ম্মপরায়ণা পত্নী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, কেবলমাত্র ঐ ঘাটের ঘরে যতকাল ইচ্ছা থাকিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন নাই, কিন্তু একখানি তক্তাপোষ, এক মণ চাল, ডাল, ঘি ও অন্যান্য ভোজনসামগ্রীও তৎসহ প্রদান করিয়াছিলেন।

† গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, ৮ম অধ্যায় ২ . পৃষ্ঠা হইতে ২:৬ পৃষ্ঠা দেখ।

স্মৃতিপথে সেই সকল কথাই পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল। সুপণ্ডিতা ব্রাহ্মণী, ঐ সকল গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের চালচলন আচার-ব্যবহারাদি সম্বন্ধে যে সকল বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ দেখিয়াছিলেন, সে সকলের সহিত ঠাকুরের চালচলনাদি তন্ন তন্ন করিয়া মিলাইয়া উহাদের সৌসাদৃশ্যও দেখিতে পাইলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় ভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া অপরের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার শক্তি ঠাকুরে প্রকাশিত দেখিলেন। আবার, ঈশ্বরবিরহবিধুর শ্রীচৈতন্যদেবের নিরন্তর গাত্রদাহ, স্রক্-চন্দনাদি যে সকল পদার্থের ব্যবহারে প্রশমিত হইবার কথা গ্রন্থনিবদ্ধ আছে, ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব গাত্রদাহ প্রশমনের জন্য ঐ সকলের প্রয়োগ করিয়া তদ্রূপ ফলও পাইলেন।* সুতরাং পঞ্চবটীতে ব্রাহ্মণীর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধীয় প্রথম দিনের দিব্যদর্শন, পূর্ব্বোক্ত কথা সকলের সহিত একযোগে সমুদিত হইয়া, তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা করাইয়া দিল, ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে এ যুগে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ দেব উভয়ে ঈশ্বরপ্রেম প্রচার করিয়া জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরাগমন করিয়াছেন! সিহড় গ্রামে যাইবার কালে, ঠাকুর নিজ দেহাভ্যন্তর হইতে কিশোরবয়স্ক দুই জনকে বাহিরে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াছিলেন—একথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি—ব্রাহ্মণী এখন ঐ দর্শনের কথা ঠাকুরের মুখে শ্রবণ করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসায় দৃঢ়তর বিশ্বাস-বতী হইলেন এবং বলিলেন "এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব!"

সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মণী সংসারে কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করিতেন না; শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসা অপরের নিকট প্রকাশে নিন্দা বা উপহাসভাগিনী হইবার শঙ্কাও রাখিতেন না। সুতরাং আপন মীমাংসা প্রথমে ঠাকুর ও হৃদয়ের নিকটে এবং পরে জিজ্ঞাসিতা হইলে অপর সকলের নিকটেও বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হইতেন না। শুনিয়াছি এই সময়ে একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীতলে মথুর বাবুর সহিত বসিয়া-

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায় ৪—৬ পৃষ্ঠা।

ছিলেন। হৃদয়ও তাঁহাদের নিকটে ছিল। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর, ব্রাহ্মণী তাঁহার সম্বন্ধে যে মীমাংসায় উপনীতা হইয়াছেন, তাহা মথুরানাথকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "সে বলে যে, অবতারদিগের যে সকল লক্ষণ থাকে, তাহা এই শরীর-মনে আছে !* তার অনেক (শাস্ত্রগ্রন্থ) দেখা শুনা আছে, কাছে অনেক পুঁথিও আছে।" মথুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে যাই বলুক্ না বাবা, অবতার ত আর দশটির অধিক নাই ? তবে তার কথা সত্য হবে কেমন ক'রে ? তবে আপনার উপর মা কালীর কৃপা হ'য়েছে, একথা সত্য।"

তাঁহারা ঐরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসিনী তাঁহাদের অভিমুখে আগমন করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন এবং মথুর ঠাকুরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনিই কি তিনি ?—যাঁহার কথা আপনি বলিতেছিলেন ?" ঠাকুর স্বীকার করিলেন এবং দেখিলেন—ব্রাহ্মণী কোথা হইতে এক থাল মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নন্দরাণী যশোদা যে ভাবে গোপালকে খাওয়াইতে সপ্রেমে অগ্রসর হইতেন, সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে যেন ভাবাবিষ্টা হইয়া, তাঁহাদিগের দিকে অন্যমনে চলিয়া আসিতেছেন। নিকটে আসিয়া মথুর বাবুকে দেখিতে পাইয়াই ব্রাহ্মণী সযত্নে আপনাকে সংযতা করিলেন এবং ঠাকুরকে খাওয়াইবার নিমিত্ত হৃদয়ের হস্তে মিষ্টান্নথালটি প্রদান করিলেন এমন সময়ে ঠাকুর, মথুর বাবুকে দেখাইয়া তাঁহাকে বলিলেন "ওগো ! তুমি আমাকে যা বল, সে সব কথা আজ ইঁহাকে ব'লছিলাম, তা ইনি বল্‌ছেন্ 'অবতার ত দশটি ছাড়া আর নাই।'" মথুরানাথও ইত্যবসরে সন্ন্যাসিনীকে অভিবাদন করিলেন এবং তিনি সত্যই যে ঐরূপ আপত্তি করিতেছিলেন, তদ্বিষয় অঙ্গীকার করিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "কেন ? শ্রীমদ্ভাগবত বাইশটী প্রধান প্রধান অবতারের কথা বলিয়া, পরে অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়াছেন ত ? তা ছাড়া বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে মহাপ্রভুর পুনরাগমনের কথার স্পষ্ট

---

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায় ৪—৬ পৃষ্ঠা।

উল্লেখ আছে এবং শ্রীচৈতন্যের সহিত (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখাইয়া) ইঁহার প্রধান প্রধান সকল বিষয়ের বিশেষ সৌসাদৃশ্য মিলাইয়া পাওয়া যায়।” ব্রাহ্মণী ঐরূপে নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের গ্রন্থে সুপণ্ডিত কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাকে ঐ বিষয় সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। ঐরূপ যে কোন ব্যক্তির নিকটে তিনি নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে সম্মতা আছেন। ব্রাহ্মণীর ঐ কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া, মথুরানাথ নীরব রহিলেন।

ঠাকুরের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণীর অপূর্ব্ব ধারণা ক্রমে কালীবাটীর ছোট বড় সকল মানবই জানিতে পারিল এবং উহা তাহাদের মধ্যে একটা বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করিল। ঐ আন্দোলনের ফলাফল আমরা অন্যত্র সবিস্তার লিপিবদ্ধ করিয়াছি।* সুতরাং এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই চলিবে যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঐরূপে ঠাকুরকে সহসা দেব-পদবীতে আরূঢ় করাইয়া, সকলের সমক্ষে তাঁহাকে দেবতার সম্মান প্রদান করিলেও, অহঙ্কার-প্রবৃদ্ধ হইয়া ঠাকুরের মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হইল না। তবে, তাঁহার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণীর পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াই যে, তিনি ঐ বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ সকলের মতামত জানিতে উৎসুক হইয়াছিলেন এবং বালকের ন্যায় মথুরানাথকে ঐরূপ পুরুষ সকলকে আনাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন—একথা সত্য। ঐ অনুরোধের ফলেই পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে পুনরাগমন হয়। বৈষ্ণবচরণের সহিত সম্মিলনে ব্রাহ্মণী কিরূপে নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে নিজ মতে আনয়ন করিয়াছিলেন, সে সকল কথাও আমরা অন্যত্র পাঠককে বলিয়াছি।†

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৫ম অধ্যায় (১৫৩—১৫৫ পৃষ্ঠা), ৬ষ্ঠ অধ্যায় (১৭১—১৭৩) ও উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায় দেখ।

† গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ ১ম অধ্যায় ১৯—২০ পৃষ্ঠা।

সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ।

(স্বামী বিবেকানন্দ।)

একদিন বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের সহিত কথাপ্রসঙ্গে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন :—

সন্ন্যাসীদের কার্য্যে—যথা মঠ ও মণ্ডলী পরিচালনা, জনসমাজে ধর্ম্মপ্রচার ও অনুষ্ঠানপ্রণালী প্রবর্ত্তন, ত্যাগ ও ধর্ম্ম মতামত সম্বন্ধীয় স্বাধীন চিন্তার সীমানিরূপণ ইত্যাদিতে—সংসারী বা কামকাঞ্চনাসক্ত ব্যক্তির মতামত দিবার কিছুমাত্র অবসর থাকা উচিত নহে। সন্ন্যাসী ধনী লোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিবে না—তাহার কাজ গরিবকে লইয়া। সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য—গরিবদের পরম যত্নের সহিত প্রাণপণে সেবা—আর এইরূপ সেবা করিতে পাইলে পরমানন্দ অনুভব করা। আমাদের দেশের সমুদয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভিতর ধনী লোকের তোষামোদ করা ও তাহাদের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করার ভাব প্রবেশ করাতে সেগুলি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। যথার্থ সন্ন্যাসী যিনি, তাঁহার কায়মনোবাক্যে ইহা ত্যাগ করা উচিত। এরূপভাবে ধনী লোকের পেছনে ঘোরা বেশ্যারই উপযুক্ত, সংসারত্যাগীর পক্ষে নহে। কাম-কাঞ্চনত্যাগ—ইহাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূলমন্ত্র—সুতরাং ঘোর কামকাঞ্চনে মগ্নব্যক্তি কি করিয়া তাঁহার শিষ্য বা ভক্তরূপে পরিগণিত হইতে পারে? তিনি ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করিতেন, "মা, আমার কাছে এমন একজন লোক কথা কয়বার জন্য এনে দে, যার ভিতর কামকাঞ্চনের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই, সংসারী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার মুখ জ্বলে গেল।" তিনি আরও বলিতেন, "সংসারী ও অপবিত্র লোকের স্পর্শ আমি সহ্য করতে পারি না।" তিনি "ত্যাগীর বাদশা" ছিলেন—সংসারী লোকে কখন তাঁহাকে প্রচার

করিতে পারে না। সংসারী গৃহস্থ লোক কখন সম্পূর্ণ অকপট হইতে পারে না—কারণ, তাহার কিছু না কিছু স্বার্থপর উদ্দেশ্য থাকিবেই। ভগবান্ স্বয়ং যদি গৃহস্থরূপে অবতীর্ণ হন, আমি তাঁহাকে কখন অকপট বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। গৃহস্থলোক যদি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতা হয়, তবে সে ধর্ম্মের নামে নিজেরই স্বার্থসিদ্ধি করিতে থাকে, আর তাহার ফল এই হয় যে, সম্প্রদায়টী একেবারে আগাগোড়া গলদে পূর্ণ হইয়া যায়। গৃহস্থগণ যে সকল ধর্ম্ম আন্দোলনের নেতা হইয়াছেন, তাহার সকলগুলিরই ঐ এক দশা হইয়াছে। ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম্ম দাঁড়াইতেই পারে না।

একজন সন্ন্যাসী শিষ্য জিজ্ঞাসিলেন,

স্বামীজি, কাঞ্চন ত্যাগ কাকে বলা যায়?

স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন,—

হাঁ, তোর প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিছি। সংসারত্যাগ করে এসেই আমার ও মঠের টাকাকড়ি রাখ্‌বার ভার তোর উপর পড়েছে কিনা—তাই তোর মনে এই সন্দেহ হয়েছে। এখন এর মধ্যে বুঝ্‌তে হবে এইটুকু যে—উপায় আর উদ্দেশ্য। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে। অনেক সময়ে দেখা যায়, উদ্দেশ্য একই, কিন্তু তার জন্য বিভিন্ন দেশকালপাত্রে বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হইতেছে। সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য—নিজের মুক্তিসাধন ও জগতের হিত করা "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" আর ঐ উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান উপায়—কামকাঞ্চন ত্যাগ। কিন্তু এটী বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ত্যাগ অর্থে মনের আসক্তি ত্যাগ—সর্ব্বপ্রকার স্বার্থের ভাব ত্যাগ। নহিলে আমি অপরের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিলাম—হাতে টাকা ছুঁইলাম না—কিন্তু টাকা দ্বারা যে সব সুবিধা হয় সব ভোগ করিতে লাগিলাম—তাহাকে কি আর ত্যাগ বলা যায়? যে সময়ে গৃহস্থেরা মনু ও অন্যান্য স্মৃতিকারগণের উপদেশ মানিয়া সন্ন্যাসী অতিথিদিগের জন্য তাঁহাদের খাদ্যের কিয়দংশ পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিতেন, সে সময় সন্ন্যাসীর পক্ষে কাছে

পয়সা কড়ি কিছু না রাখিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিলে কাঞ্চন ত্যাগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। এখন কিন্তু কালধর্ম্মে গৃহস্থের সে ভাব বড়ই কম—বিশেষতঃ, বাঙ্গালাদেশে ত মাধুকরী ভিক্ষার প্রথাই নাই। এখন মাধুকরী ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া থাকিকার চেষ্টা করিলে অনর্থক শক্তিক্ষয়ই হইবে,* কিছু লাভ হইবে না। ভিক্ষার বিধান কেবল সন্ন্যাসীর পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যদ্বয় সিদ্ধির জন্য—কিন্তু ঐ উপায়ে এখন আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং এ অবস্থায় যদি কোন সন্ন্যাসী নিজের জীবনযাত্রার উপযোগী মাত্র অর্থের সংগ্রহ করিয়া যে উদ্দেশ্যে তিনি সন্ন্যাস লইয়াছেন, তাহার সিদ্ধির জন্য সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহাতে সন্ন্যাসধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীতাচরণ হয় না। অনেক সময় লোকে অজ্ঞতাবশতঃ উপায়কেই উদ্দেশ্য করিয়া তুলে। দুই একটা দৃষ্টান্ত ভাবিয়া দেখ। অনেক লোকের জীবনের উদ্দেশ্য—ইন্দ্রিয়সুখভোগ। তাহার উপায়-স্বরূপে সে টাকা রোজগার করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এখানেও উদ্দেশ্য ভুলিয়া উপায়ের প্রতি এতদূর আসক্ত হয় যে, টাকা সঞ্চয়ই করিতে থাকে, উহা ব্যয় করিয়া যে ভোগ করিবে, তাহার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাহার থাকে না। আরও দেখ, কাপড় চোপড় কাচিবার উদ্দেশ্য—শুচি ও শুদ্ধ হওয়া। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে কাপড় চোপড় শুধু একবার জলে ফেলিয়া নিংড়াইয়া লইলেই শুচি হইলাম মনে করি। এই সব জায়গায় আমরা উপায়কে উদ্দেশ্যের আসনে বসাইয়া গোলমাল করিয়া ফেলি। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কখনই ভুলা উচিত নহে।

---

* অবশ্য ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, স্বামীজি মাধুকরী ভিক্ষার বিপক্ষ ছিলেন। তিনি অনেক সন্ন্যাসী শিষ্যকে মাধুকরী ভিক্ষা করাইয়াছেন এবং স্বয়ংও অনেক দিন উহা করিয়াছেন। এখানে তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কাঞ্চন ত্যাগ বলিলে উহার অর্থ সকল সময়ে সকল অবস্থায়ই যে অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা ঠিক নহে। ইতি লেখক।

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)।

(ইনি যোগিনী মা নামে পরিচিতা ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার জীবনকাহিনীর কতক কতক অংশ তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছি, তদবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।)

১

আজ যথার্থই পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যখন গৃহে ছিলাম, তখন এই পথটী বড় লোভনীয় বলিয়া মনে হইত। পাখী যেমন খাঁচার পথ খুঁজে, তেমনি মন দিবানিশি পথের চিন্তাই করিত। কেবলই মনে হইত, "কবে আমি পথে বাহির হইব ?" আজ এতদিনের সেই সাধ পূর্ণ হইয়াছে, যথার্থই আমি পথে বাহির হইয়াছি।

আমি আজ পথে বাহির হইয়াছি! ভাবিলে যেন আশ্চর্য্য হইতে হয়। কিন্তু জগতে "আশ্চর্য্য" বলিয়া কোন কথা নাই। আমি যে পথে বাহির হইয়াছি, একথা যেন আমি নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিতে-ছিলাম না। কিন্তু এই তো তারকেশ্বরের রাজপথ, চৈত্রের গাজন উপলক্ষে সন্ন্যাসীর দল পথে ভিড় করিয়া চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে গগন-ভেদী স্বরে "বম্ বম্ মহাদেব" ধ্বনি উঠিতেছে। সেই পথেরই এক-প্রান্তে আমি দাঁড়াইয়া আছি। দাঁড়াইয়া আছি কেন, না, সন্ন্যাসীর ভিড়ে পথে চলিতে পারিতেছিনা, নহিলে আমার অতি উৎকণ্ঠিত মন কখনও এমন ভাবে পথপ্রান্তে আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দিত না।

মনের এই দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি যে কতদিন হইতে হইয়াছে, ভাবিয়া তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। মনে হয় যেন আমার জ্ঞানের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই এই উৎকণ্ঠারও সঞ্চার হইয়াছে, ক্রমশঃ তাহা নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে আর এই পূর্ণ একবিংশতি বৎসরে সেই উৎকণ্ঠা আর

সকল ভাবের আশ্রয়ই পরিহার করিয়া কেবলমাত্র একই ভাবে একাগ্র হইয়া এতই বলশালী হইয়াছে যে,—আমি কুলকন্যা, কুলবধূ—আজ আমাকে পথের বাহির করিয়াছে।

দ্বাদশ বৎসরে বিবাহান্তে প্রথমে শ্বশুরগৃহে গিয়া রুগ্ন স্বামীর শুশ্রূষার ভার পাইয়াছিলাম। পুতুল খেলায় যেমন আমার তন্ময়তা ছিল, দেখিলাম পীড়িতের শুশ্রূষায়ও মন ঠিক সেই রকমই লাগিয়া গিয়াছে। তখন কি চিন্তা ছিল? কখন্ স্বামীকে পথ্য দিতে হইবে, কখন্ ঔষধ খাওয়ার সময়, কোন্‌টী ত্রুটি হইল, এই সকল বিষয় গুলিই তখন আমার চিন্তার বিষয় ছিল। আমি প্রায় সর্ব্বদাই স্বামীর প্রয়োজন মত তাঁহার নিকটে উপস্থিত থাকিতাম। নববধূর এরূপ আচরণ অনেকে পছন্দ করিতেন না। এইরূপ আচরণে যে আমার নিন্দা হইত না তাহা নহে। কতবার স্বকর্ণে নিন্দা শুনিয়াছি,—কিন্তু কি যে বিচিত্র স্বভাব, নিন্দা হইবে এজন্যও কিছুমাত্র শঙ্কা হইত না।

পিত্রালয়ে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ ছিলেন। মা বলিয়াছিলেন, "চুরি করিলে শ্যামসুন্দর পাপ দেন, মিথ্যা কথা বলিলে শ্যামসুন্দর পাপ দেন।" কিন্তু আমি মাঝে মাঝে চুরি করিয়া—ঘরে চাল আলু আর পোস্ত থাকিত তাহাই লইয়া—ভিখারীদের দিতাম।—"শ্যামসুন্দর যদি পাপ দেন?" তখনই শ্যামসুন্দরের কাছে যাইতাম, বার বার প্রণাম করিয়া বলিতাম, "শ্যামসুন্দর পাপ দিওনা" "শ্যামসুন্দর পাপ দিওনা"। শ্যামসুন্দরের দিকে চাহিয়া দেখি, তিনি হাসিতেছেন, "নাঃ, শ্যামসুন্দর আমায় কখনো পাপ দেবেন না। না হলে হাস্‌ছেন্ কেন?"—আমাদের সেই শ্যামসুন্দর! যে কাজটায় বিপদে পড়ি,—শ্যামসুন্দর সহায় আছেন। দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে বলি, "শ্যামসুন্দর, দুধ যেন উৎলে পড়ে না।" কড়ি খেলতে বসে বলি, "শ্যামসুন্দর, আমার যেন ভাল দান পড়ে।"

আমাদের সেই শ্যামসুন্দর! স্কুলে গিয়া শুনিলাম—মেম্ বলিতেছে, "মাটীর ঠাকুর সত্য নহে, মিথ্যা; একমাত্র ঈশ্বরই সত্য। তোমরা বল, প্রতিমা পূজা করিব না।" মেয়েরা সমস্বরে বলিত, "প্রতিমা পূজা করিব না।" শুনিয়া রাগে আমার শরীর জ্বলিতে লাগিল। শ্যামসুন্দর

তো মাটীর ঠাকুর, শ্যামসুন্দর নাকি মিথ্যা? স্কুলের ছুটি হইলে সকল মেয়েদের একত্র করিয়া বলিলাম, "ভাই, তোমরা বল তো শ্যামসুন্দর সত্য না মিথ্যা?" আমার কথায় সকল মেয়ের মুখ শুখাইয়া গেল, তাহারা একথা মোটেই ভাবে নাই। আমি বলিলাম,—খুব রাগিয়াই বলিলাম, "শ্যামসুন্দর সত্য, সত্য, সত্য, কখনও মিথ্যা নয়। কাল স্কুলে গিয়া মেমের সম্মুখে এই কথা বলিবে।" তখনই মেমের হস্তস্থিত সেই সুগোল লম্বা বেতগাছটী সকলের স্মৃতিপথে উদিত হইল। সে বেতকে কে না ভয় করে? আবার আমার রাগকেও ভয় আছে। কয়েকজন সকাতরে বলিল, "মেম্, ভাই তা হলে মারবে।" মার খাবার ভয়? শঙ্কা কাহাকে বলে, সে জ্ঞান বিধাতা আমায় দেন নাই। কেন? না, সকল মেয়েই প্রহার যে কেমন মধুর তাহা বেশ জানে, কেবল আমিই জানিনা। প্রহারের সঙ্গে আমার এ পর্য্যন্ত কোন পরিচয় নাই। আমি বলিলাম, "আমি সকলের আগে দাঁড়াইব। মেম যদি মারে, আমি মার খাইব, বলিব যে আমিই সকলকে শিখাইয়াছি।"—মেয়েরা আমার উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আবার ভয়ও পাইতে লাগিল। যাহা হউক শেষে তাহাদের ভয় সারিয়া গেল।

পরদিন বিদ্যালয়ে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের সময় আমি সকলের আগে দাঁড়াইয়াছি, মেয়েরা আমার কিছুদূরে পিছনে। মেমের হাতের কাছে সেই সুগোল লম্বা চকচকে বেতগাছটী আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া আমার ভয় হইবে কি, "শ্যামসুন্দরকে মিথ্যা বলিয়াছে?" তাহাই মনে করিয়া রাগে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিতেছিল। যাই মেম্ বলিল, "মাটীর ঠাকুর সত্য নহে, মিথ্যা," তৎক্ষণাৎ আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, "মাটীর ঠাকুর সত্য, সত্য, সত্য"। আমার পিছন হইতে মেয়েরাও সেই সঙ্গে যোগ দিল। মেম একেবারে নির্ব্বাক্, রাগ করিবে কিনা তাহা যেন বুঝিতেই পারিল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, অবশেষে অঙ্গুলী-সঙ্কেতে আমাকে নিকটে ডাকিয়া মৃদু মিনতির স্বরে বলিল, "শরৎ, বালিকা নষ্ট করিও না।"

মেয়েরা ভাবিয়াছিল, আমাকে খুব মার খাইতে হইবে, কিন্তু ঠিক

তাহার বিপরীত হইল। সেইদিন হইতে মেমের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হইয়া গেল। আমি দুপুর বেলায় জল খাবারের ছুটীর সময় বাড়ী হইতে কোঁচড়ে করিয়া কাঁচা পেয়ারা আনিয়া সকল মেয়েদের সঙ্গে একত্রে যখন খাইতাম, মেমকেও দুটী একটী দিতাম। অবশেষে মেমের পেয়ারার উপর অতিশয় লোভ দেখিয়া একদিন এক ঝুড়ি পেয়ারা আনিয়া দিয়াছিলাম।

শ্যামসুন্দরের কথা যখন উঠিল, তখন সেই গোয়ালার ছেলের কথা আরও দুএকটী বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। মা কথায় কথায় বলিতেন, "শ্যামসুন্দর গোয়ালার ছেলে।" মার কথায় প্রথম প্রথম আশ্চর্য্য হইতাম, ভাবিতাম—ব্রাহ্মণ হইয়া আমরা গোয়ালার ছেলের প্রসাদ কেমন করিয়া খাই? তার পরে দেখিলাম, শ্যামসুন্দর গোয়ালার ছেলে হইলে কি হয়, শ্যামসুন্দরই বাড়ীর রাজা। যখন ধানভানা হইতেছে, তখন শুনি যে, শ্যামসুন্দরের জন্য চাল হইতেছে; যখন ডাল ভাঙ্গা হইতেছে, তখন শুনি যে, শ্যামসুন্দরের ডাল, হাত দিতে নাই; এই রকম তরী-তরকারি দই সবই শ্যামসুন্দরের; বেশী কথা কি, খাবার জিনিষ মাত্রই শ্যামসুন্দরের। তবে আর শ্যামসুন্দরের প্রসাদ না খাইয়া উপায় কি, প্রসাদ না খাইলে কি উপবাস করিয়া মরিব? মাকে যখন বলিলাম, "মা, শ্যামসুন্দর যে গোয়ালার ছেলে, প্রসাদ খাইলে জাত যায় না?" মা শুনিয়া হাসিলেন, বলিলেন, "এখনও কি আর গোয়ালাই আছে, বামুন বাড়ী থেকে থেকে বামুন হয়ে গিয়েছে।" মা আমাদের চেয়েও শ্যামসুন্দরকে বেশী ভালবাসিতেন। একদিন ভোগ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। মা স্নান করিয়া আঁচল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন, ঘুম ভাঙ্গিবা-মাত্র উঠিয়াই বলিলেন, "ভোগে চুল আছে, আজ শ্যামসুন্দরের খাওয়া হয় নাই। আমায় হাত দিয়ে দেখিয়ে গেল যে, ভোগে এই এত বড় এক গাছি চুল আছে, আমার খাওয়া হয় নাই।" ভোগ আনিয়া ভাঙ্গিয়া দেখিলেন, যথার্থই ভোগের ভিতর চুল, দেখিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন—"বেলা কি কম হয়েছে, শ্যামসুন্দর উপবাসী আছেন।" আমাদের যদি কোনদিন খাওয়া না হয়, মা কি তাহলে কাঁদেন? জ্বর হয়ে যে কতদিন

উপবাস করে থাকি, মা একদিনও তো কাঁদেন না। আর আজ শ্যামসুন্দরের খাওয়ার বেলা হয়ে গেল বলে মার এত কান্না।

শ্যামসুন্দরকে আমরা যখন তখন গিয়া প্রণাম করিতাম। বাবা মাকে কখনও প্রণাম করি নাই; ঠাকুরের নিকট বাবা মা যেমন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন, কেবল সেই রকম প্রণাম করিতে শিখিয়াছিলাম। শ্বশুরবাড়ী গিয়া প্রণাম করিতে হয়, মা অনেক করিয়া বলিয়াছেন। কেমন করিয়া প্রণাম করিতে হয়, আমি তো জানি না; সকলের পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, সকলে দেখিয়া হাসিয়া খুন, "এ আবার কি প্রণাম?" আবার কেহ বা "এত বড় মেয়ে প্রণাম করিতেও জানে না?" বলিয়া নিন্দা করে।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি।—নিন্দা হইবে এ ভয় আমার কোন কালে ছিল না, সেজন্য অনেকের প্রিয় হইতাম আবার অনেকের অপ্রিয় হইতাম। স্বামী কিছুদিন ভুগিয়া সেবার আরাম হইলেন, মনে হইল যেন বেশ সুস্থ হইয়াছেন। আমাকে বলিলেন, "তুমি এবার আমায় বাঁচাইলে।" আমি হাসিতে লাগিলাম, "আমি বাঁচাইলাম! বেশ তো কথা! আমি কি শ্যামসুন্দর নাকি?" স্বামী আরাম হইলেন, কিন্তু ভাল করিয়া খাইতে পারিতেন না। আমার উপর রাঁধিবার ভার ছিল। রাঁধিতে গিয়া আমার কান্না আসিত, এত অল্প তেল ঘিয়ে কেমন করিয়া রাঁধিব? স্বামী রান্না ঘরে আসিয়া দেখেন, আমি কাঁদিতেছি; কান্নার কারণ জানিয়া ভাঁড়ার হইতে লুকাইয়া তেল ঘি আনিয়া দিতেন। সকলে রান্নার খুব সুখ্যাতি করিত, কিন্তু যিনি লুকাইয়া তেল ঘি আনিয়া দিতেন, অর্দ্ধেক সুখ্যাতি তাঁহার হওয়া উচিত ছিল।

ছয়মাস কাটিয়া গেল। ছয়মাস পরে আমি একখানি পত্র পাইলাম, সেখানি আমার স্বামীর কোন ডাক্তার বন্ধু লিখিয়াছেন। তাঁহার পত্রে জানিলাম, আমার স্বামী ক্ষয়রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। আরও তিনি আমায় লিখিয়াছেন, আপনার স্বামীর জীবনের স্থায়িত্বের অনেকটা আপনারই উপর নির্ভর করিতেছে। কেন, তিনি তাহা একবারে খুলিয়া লেখেন নাই, তবে তাহার কিছু আভাস পাইয়াছিলাম।

আমার বয়স তখন ত্রয়োদশবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। আকস্মিক বজ্রপাতের তুল্য এই পত্রখানি পাইয়া সহসা আমি বালিকাকাল হইতে একেবারে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইলাম। বৈধব্যই যে আমার অদৃষ্টের অখণ্ডনীয় বিধিলিপি, সেইদিন তাহা বুঝিলাম। সে বিধিলিপি কতদিনে পূর্ণ হইবে, স্বামীর আয়ু—আর কতদিন তাহা আমি জানি না, শ্যামসুন্দর জানেন; কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র ত্রুটিতেও যেন তাঁহার এই অল্পাবশিষ্ট দিন আরও হ্রাস না হইয়া যায়, সেজন্য আমি সেইদিন হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। একটী একটী দিন যাইত, আর ভাবিতাম, জানি না আর কতদিন!—সে কি দারুণ উৎকণ্ঠা? প্রতি মুহূর্ত্ত সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণামের প্রতীক্ষায় রহিতাম। আমি যে এই অবস্থায় প্রতি মুহূর্ত্ত যাপন করিতাম, স্বামী তাহা অনুভবও করিতে পারিতেন না। তখন আমি এতই কপটতা শিখিয়াছিলাম।

যে দিনের প্রতীক্ষায় দিনে দিনে পলে পলে এই দারুণ উৎকণ্ঠা বহন করিতেছিলাম—সে দিন আসিল, আবার সে দিন অতীতও হইয়া গেল। কিন্তু আমার কি উৎকণ্ঠার শেষ হইল? তাহা তো নয়! মন যখন শোকের জড়তা হইতে কিছু পরিমাণে মুক্ত হইল, তখন প্রথমেই মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল, "এ জীবন কিসের জন্য?" কেন যে বাঁচিয়া আছি, বাঁচিয়া থাকিয়া যে কি লাভ হইবে, এইরূপ প্রশ্নের অঙ্কুশে মন দিবানিশি আহত হইতে থাকিল। গুরুর নিকট মন্ত্র দীক্ষা লইব, তখন এই আবার এক নূতন কামনা, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্র দীক্ষা পাইব, এই এক নূতন উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইল।

এ জীবন এই ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। অতিশয় বেগবতী নদী যেমন উপলখণ্ডের বাধা মানেনা, মন সেইরূপ নিন্দা প্রশংসার বাধা মানে নাই, সামাজিক নিয়মেরও বাধা কখনও মানিয়া চলে নাই। কিন্তু একটু বিশেষত্ব ছিল—মন যাহা মনে করিত "ইহাই বিধি", প্রাণপণে তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিত। তখন কেবল এই দিকেই লক্ষ্য থাকিত, যাহা নিয়ম তাহা যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হয়। এইজন্য দীক্ষা লইবার

পর পূজার্চ্চনায় যখন মন নিবিষ্ট হইল, তখন সে এক বিষম রাজসিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। পূজায় ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি ষোড়শোপচারের কোন অঙ্গহানি হইত না। পঞ্চদেবতা, নবগ্রহ, কল্পবৃক্ষ প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিতে দিবা অবসানপ্রায় হইত। মা আমার, আমার জন্য অনাহারে প্রসাদ লইয়া বসিয়া থাকিতেন, কোনদিন একটুও অনুযোগ করিতেন না। কিন্তু আর সকলেই, এমন কি, পিতা পর্য্যন্ত আমার এই বিষম বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হইতেন।

তবুও তো মনের সেই উৎকণ্ঠার অনলদাহ নিবিল না! তৃপ্তি কোথায়?—কিছুদিন মন মন্ত্রদীক্ষা পাইয়া "একটা কিছু পাইয়াছি"—বলিয়া যেন কতক শান্ত ছিল, কিন্তু আবার যত দিন যাইতে লাগিল, "দীক্ষা লইয়া কি পাইলাম" মনে ক্রমশঃ এই বিচার উঠিতে লাগিল। পূজার্চ্চনার নিরূপিত সময় ক্রমেই যত বাড়াই, ব্যাকুলতাও তত বাড়িয়া যায়। "কোথায় তুমি হে উপাস্য, আমার আকাঙ্ক্ষার নিধি! এ জীবনে ধরা তো দিলে না। তবে আর এ বৃথা জীবন বহন করিয়া ফল কি? প্রতিদিন এই সকাল, এই সন্ধ্যা, এই আহার নিদ্রা নিত্যকর্ম্ম—ইহা ভিন্ন জীবনে আর কি আছে? পূজার্চ্চনা,—সেও তো নিয়মিত নিত্য কর্ম্ম মাত্র! এমন জীবন আর আমার সহ্য হয় না।" একদিন স্নান করিতে গিয়া মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিলাম, "এ জীবন আর রাখিব না।" দুর্দ্দম মনোবেগ আজ আমাকে আত্মহত্যারূপ পাপের পথে প্রবৃত্ত করিল।—সাঁতার দিতে আমি মৎস্যের মত পটু, তবে কেমন করিয়া ডুবিব? জল লইবার জন্য যে কলসী আনিয়াছিলাম, তাহাই গাত্রমার্জ্জনী সাহায্যে দৃঢ় করিয়া গলায় বাঁধিলাম, বাঁধিয়া ধীরে ধীরে নদীতে নামিয়া নিশ্চিন্তমনে জলে ডুবিলাম। জলে ডুবিতেছি বলিয়া মনে কোনও বিশেষ ভাবের উদয় হইল না।

জলে ডুবিয়াই প্রথমে সমস্ত শরীরে কি যেন এক ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল, আমার সমস্ত লোমকূপ দিয়া তড়িৎপ্রবাহ নির্গত হইতেছে, আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন শত শত তারা জলিতেছে, পদতল হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত কি যেন এক তড়িৎ-

প্রবাহ ছুটাছুটী করিতেছে! আমার নিজের অনিচ্ছাতেও গলার কলসী খুলিয়া ফেলিবার জন্য কতই চেষ্টা করিলাম। তখন জলে ডুবিয়া মরিতেছি অথবা কি করিতেছি তাহা কিছুই বোধ ছিল না; তখন সেই দুঃসহ অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা ও যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা—ইহাই কেবল অনুভবের আয়ত্তে ছিল।

কিন্তু সে যন্ত্রণা আর অধিকক্ষণ রহিল না, তাহার পরেই যেন স্বপ্নের আবেশের মত একটা ভাবের শীতলস্পর্শে সকল যন্ত্রণা জুড়াইয়া গেল। মনে হইল যেন অগাধ স্বপ্নসমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছি। জীবনের প্রতিদিনের কত শত ঘটনা ধীরে ধীরে স্বপ্নের মত আমার মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, কোন ঘটনা সুখের রাগে রঞ্জিত ও কোনটী দুঃখাশ্রুতে অভিষিক্ত। কিন্তু সে সকল অতীত সুখ দুঃখ এখন আর মনকে স্পর্শ করিতেছে না, অতি লঘু মেঘের মত কেবল মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে মাত্র। কেবল এক অপূর্ব্ব শান্তি-প্রবাহ এই সলিলপ্রবাহের মত অথবা জননীর বাহুবেষ্টনের মত আমার প্রাণ মন বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আঃ সে কি শান্তি! যেন আমি বহুদিনের পরিশ্রান্ত, আমার চক্ষে আজ মধুময় নিদ্রার আবেশ আসিয়াছে। ক্রমশঃ সেই সুষুপ্তিসমুদ্রে আমি একেবারে ডুবিয়া গেলাম। ডুবিয়া গিয়া এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম। সে কি স্বপ্ন, না প্রত্যক্ষ দর্শন? তাহা আমি এখনও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। স্বপ্নই হউক অথবা সত্যই হউক যাহা দেখিলাম, সোহাগা যেমন স্বর্ণের সঙ্গে একেবারে গলিয়া মিশিয়া যায়, আমার জীবনের সঙ্গে তাহা যেন একেবারে মিশিয়া গেল। সে স্বপ্ন নিবিড় আনন্দতুলিকায় চিত্রিত; এমন আনন্দ, যে, সে কেবল অনুভবের সামগ্রী, বাক্য তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না।

গভীর স্বপ্নে ডুবিয়া আমি যে কোথায় ছিলাম, তাহা কিছুই জানিতে পারি নাই। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম, আমি জলের উপর ভাসিতেছি; গলার কলসী কি জানি কেমন করিয়া খুলিয়া গিয়াছে। এত দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছিলাম, তাহা কেমন করিয়া খুলিল

ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক সেদিন আত্মহত্যার বাসনা একেবারে ডুবাইয়া দিয়া গৃহে ফিরিলাম।

তাহার পর জীবনের আর এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। আমার কোন আত্মীয় কাশীধামে গিয়া কিছুদিন যোগ অভ্যাস করিতে-ছিলেন। তিনি গৃহে আসিলে কেহ কেহ তাঁহার নিকট "ক্রিয়া" লইবার জন্য উৎসুক হইল। এই "ক্রিয়া" পদার্থটী কি জানিবার জন্য আমারও মন কিছু উৎসুক হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা "ক্রিয়া" লইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল, তাহারা যখন কেহই প্রার্থনা করিয়া প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত হইল না, তখন অগত্যা আমারও সে বিষয়ে ঔৎসুক্য পরিহার করিতে হইল। কিন্তু একদিন, কেন জানিনা তিনি নিজেই আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "তুমি ক্রিয়া লইবে?" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহাতে ফল কি হইবে?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "বাহ্য বিষয় হইতে মন বিনিবৃত্ত হইয়া যাহাতে ভগবৎপাদপদ্মে সংলগ্ন হয়, এই 'ক্রিয়া'র ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য।" অনেকে প্রার্থনা করিয়াও যাহা পায় নাই, আমি শ্যামসুন্দরের কৃপায় অযাচিতভাবে তাহাই পাইলাম ভাবিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হইল। যে অবধি তাঁহার নিকট দীক্ষা পাইলাম, নিদ্রা সেই অবধি একেবারে আমাকে পরিত্যাগ করিল। পরীক্ষা সম্মুখে উপস্থিত হইলে বিদ্যার্থী যে ভাবে রজনী যাপন করে, সমস্ত রজনী "ক্রিয়া" লইয়া আমি সেই ভাবেই যাপন করিতাম। কখনও বা গুরুদেবের চরণ সন্নিধানে উপস্থিত হইবার জন্য মনে প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হইত। রাত্রিকালে—আমি রমণী—আমার পক্ষে এরূপভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া নিতান্তই অবিধেয় ভাবিয়া মনকে সংযত করিতাম। কিন্তু আমি যে রমণী, তাহা তো সকল সময় স্মরণ থাকিত না। আমার এই ক্রিয়া লইবার কথা কেবল আমার মা ও ছোট ভাই চণ্ডী জানিতেন। মাকে বলিতাম, "মা, তুমি আমার ঘরের দরজায় শিকল দিয়া রাখিও। কি জানি হঠাৎ যদি আমি মনের ভুলে বাটী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাই, তবে লোকে তোমাদের নিন্দা করিবে।"

আমার সে সময়ের মনের অবস্থা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? ঘরে আগুন লাগিলে গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য লোকের যেমন আগ্রহ হয়, আমারও গৃহত্যাগ করিবার জন্য সেইরূপ মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। সংসার যেন দাবানলের মত মনে হইত; লোকে যে সকল সাংসারিক বিষয়ে আলাপ করিত, তাহা যেন আমার কর্ণরন্ধ্র দগ্ধ করিত। নিদ্রা তো পূর্ব্বেই গিয়াছিল, তখন আহারেও বিষম বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। লোকের সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলাম। একবাটী ঘি আমার সমস্ত দিনের আহার ছিল, কিন্তু ঘি পুষ্টিকর দ্রব্য বলিয়া শরীর বিন্দুমাত্র দুর্ব্বল হয় নাই। মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন সহসা একদিন একখানি মাসিক পত্রের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একটী প্রবন্ধ চোখে পড়িয়া গেল। প্রবন্ধটীর নাম "করমেতি বাই"। প্রবন্ধটী পড়িতে আরম্ভ করিয়া আর ছাড়িতে পারিলাম না। ক্রমশঃ যখন পড়িলাম, কৃষ্ণের উদ্দেশে গৃহত্যাগিনী বালিকা করমেতি আত্মীয় স্বজনের চক্ষে পড়িবার ভয়ে গলিত উষ্ট্রের উদরগহ্বরে কেবল কৃষ্ণ-নামামৃত পান করিয়া তিন দিন যাপন করিলেন, তখন আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিল; হাত হইতে পুস্তক খসিয়া পড়িল ইহা বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু তাহার পর আর বিন্দুমাত্রও জ্ঞান ছিল না।

সাতদিন সেইরূপ অচৈতন্য অবস্থায় চলিয়া গিয়াছিল। বাবা সপরিবারে নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, বাড়ীতে কেবল একা আমি ছিলাম। আমি কাহারও সহিত মিশিতে ভালবাসিনা বলিয়া কেহ আমার বড় একটা উদ্দেশ লইতেন না। কেবল একজন—(তাঁহাকে আমি মাসিমা বলিতাম) তিনিই মাঝে মাঝে আমার খোঁজ লইতেন। সাতদিন পরে তিনিই আসিয়া আমার উদ্দেশ লইয়াছিলেন।

গৃহে আর কিছুতেই থাকিব না। এতদিনে সমুদায় দ্বিধা একেবারেই ছিন্ন হইয়া গেল। এবার কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে চলিলাম। সে কোথায়? কোথায় তাঁহার উদ্দেশ পাইব? তখনই মনের ভিতর হইতে উত্তর পাইলাম, করমেতি যেখানে গিয়াছিলেন, সেখানে—সেই বৃন্দাবনে!

শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া গৃহের বাহির হইলাম। শ্যামসুন্দর!

তুমি তো এই ঘরেই ছিলে, তবে ঘর ছাড়িয়া আবার কোথায় তোমাকে খুঁজিতে চলিলাম? আমি তাহা জানি না। ঘরে যখন ছিলাম, তুমিই আমাকে গৃহে রাখিয়াছিলে; আজ যে পথে বাহির হইয়াছি, তুমিই আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছ। কোথায় লইয়া যাইতেছ, তুমিই তাহা জান।

আজ আমি রাজপথে দাঁড়াইয়া আছি। আমার গৃহ নাই, আশ্রয় নাই, সঙ্গীও কেহ নাই। একি আনন্দ, একি মুক্তি! এই যে বিচিত্র লোকপ্রবাহ রাজপথ দিয়া চলিয়াছে, ইহার মধ্যে আমি নিঃসঙ্গ, আমি একক। সঙ্গের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিঃসঙ্গের পরিপূর্ণতায় আমার চিত্ত আজ ভরিয়া উঠিয়াছে।

আমি পথের একধারে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একটী ছোট ছেলে আসিয়া আমার আঁচল ধরিয়া টানিল। ছেলেটীর বয়স ৬।৭ বৎসর হইবে। কি যে তাহার সুন্দর মুখ খানি—যেন ভালবাসায় মাখা। আঁচল ধরিয়া টানিয়া সে আমাকে কি যেন বলিতেছিল, কিন্তু আমি তাহা শুনিতে পাইলাম না,—কেবল "বম্ বম্ মহাদেব" "জয় শিব শঙ্কর!" ধ্বনিই কাণে আসিতেছিল। আমি তাহার কথা শুনিতে পাইতেছি না দেখিয়া সে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। অল্প দূরে দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা ছোট একখানি বাড়ী ছিল, সেই বাড়ীর দরজায় নিয়া আসিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বাবা, তুমি আমাকে এখানে আনিলে?" সে হাসিয়া বলিল, "মা তোমায় ডাক্‌ছেন, ঐ দেখ মা আস্‌ছেন।" তাহার নির্দ্দেশ মত চাহিয়া দেখিলাম, দরমা-ঘেরা উঠান দিয়া মা আসিতেছেন, মাই বটে, মুখের দিকে চাহিলেই মা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে। মা আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি ঐ জানেলা দিয়া দেখিলাম, আপনি ওখানে দাঁড়াইয়া আছেন। আমার মনে হইল, যেন আপনার আজ-কালের ভিতর কিছুই আহার হয় নাই। তাই খোকাকে দিয়া আপনাকে ডাকাইয়াছি। দয়া করিয়া আমার গৃহে ভিক্ষা করিবেন কি?" আমি মায়ের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে

চাহিলাম। "যথার্থই আমি দুইদিন অনাহারে আছি," আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলাম, "ইনি তাহা কি করিয়া জানিলেন! রাজপথ দিয়া তো কত লোক যাতায়াত করে, কে কাহাকে দেখে, কেই বা কাহার উদ্দেশ লয়? এমন কে আছে, যে পথের লোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, 'তুমি কি অনাহারে আছ?'—এই বিশাল জনতার একপার্শ্বে যে একজন গৈরিকবস্ত্রধারিণী দাঁড়াইয়া আছে, গৃহস্থবধূর তাহার দিকেই বা দৃষ্টি পড়িল কেন?" শ্যামসুন্দরের এই বিচিত্র লীলার কথা ভাবিতেছি, এমন সময় শিশুর জননী আমাকে পুনরায় বলিলেন, "মা, গৃহী বলিয়া কি আপনি আমার গৃহে ভিক্ষা লইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন?—মা, আজ দশমী, আপনি বোধ হয় দুই তিন দিন অনাহারে আছেন, আমি করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, আজ আপনি এই গৃহে ভিক্ষা লইয়া কৃতার্থ করুন।" তিনি এই কথা বলিয়া যোড়-হাতে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমিও যোড়হাত করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। বলিলাম, "মা, তোমার অন্ন গ্রহণ করিলে আমার কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। যথার্থই আমি দুইদিন অনাহারে আছি। তুমি তোমার সন্তানকে যাহা খাইতে দিবে দাও।"

বাড়ীর উঠানের একপাশে ঢেঁকিশালা, সেখানে ছোট একটী উনান ছিল। শিশুর জননী অতি সত্বর সেইস্থান মার্জ্জন করিয়া রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। একটা ছোট ঘড়ায় এক ঘড়া জল, পিতলের একটী জলপাত্র, একটী মালসা, আতপ চাল, কাঁচকলা ও কিছু মাখন, রন্ধনের এই সকল উপকরণ আনিয়া দিলেন। আমি সেই পবিত্র অন্ন রন্ধন করিয়া শ্যামসুন্দরকে নিবেদন করিলাম। সে অন্নে যেন অমৃতের আস্বাদ ছিল। সেই অন্ন আহার করিয়া আমার শরীর ও মনের সমস্ত জড়তা দূর হইয়া গেল।

আহার শেষ হইলে গৃহস্থবধূ আবার আমার নিকটে আসিলেন। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, যদি তুমি আমার অপরাধ গ্রহণ না কর, তবে আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তুমি এখন কোথায় যাইবে?"

আমি বলিলাম, "আমি পশ্চিমের পথে চলিয়াছি, যেদিন যতদূর পারি চলিব।"

গৃহস্থবধূ বলিলেন, "তবে মা, তুমি আজ রাত্রি এখানে যাপন কর। কাল আমাদের একজন পরিচিত লোক বৰ্দ্ধমান যাইবেন। তাঁহার সঙ্গে তুমি বৰ্দ্ধমান পর্য্যন্ত যদি যাও, তাহা হইলে তোমার পথ চলার অপেক্ষা একটু শীঘ্র যাওয়া হইবে।"

সে রাত্রি সেই গৃহেই থাকিলাম। পরদিন যখন বৰ্দ্ধমান ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, তখন প্রায় অপরাহ্ণ। প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়িয়া যেখানে কাঁকরঢালা পথে পাদচারীরা চলিতেছে, সেখানে একটী আলোকস্তম্ভের কাছে আমি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া লোকের ব্যস্তগতি আর যাওয়া-আসা দেখিতেছিলাম। কেবলি কি যাওয়া আর আসা! আর কিছু নয়? আমাকে এখন কোথায় যাইতে হইবে? যাওয়া আসা দেখিয়া সে কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

দিনের আলো ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। একজন আসিয়া আলোক জ্বালিয়া দিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে আর একটী ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে অনেকক্ষণ হইতে আমাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, আমি পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারি নাই। তিনি একটু সঙ্কোচের সহিত আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, আপনি কোথায় যাইবেন?" প্রশ্ন করিবার তাৎপর্য্য আমি প্রথমে ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, "আপনি অনেকক্ষণ এখানে একা দাঁড়াইয়া আছেন দেখিতেছি। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। বৰ্দ্ধমানে কি কেহ আপনার আত্মীয় আছেন?" আমি বলিলাম, "আমি আজ প্রথম বৰ্দ্ধমানে আসিয়াছি। এখানে আমার পরিচিত কেহ নাই।"

তিনি বলিলেন, "তবে আপনি রাত্রে কোথায় থাকিবেন, তাহা বোধ হয় এখনও স্থির করেন নাই। যদি আপনার মত হয়, তাহা হইলে আমি আমার কোন পরিচিতের গৃহে যাহাতে আপনি রাত্রি যাপন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারি। সেখানে আপনার কোন অসুবিধা হইবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কোথায়? ষ্টেশন হইতে কতদূর?"

তিনি বলিলেন "বেশী দূর নয়।"

আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। যিনি "মা" বলিয়া ডাকিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে যাইতে আমার কিছুই দ্বিধা হইল না। কিছুদূর চলিয়া অবশেষে একটী বাড়ীর নিকট আসিয়া তিনি বলিলেন, "এই বাড়ী";—বলিয়া দরজার কড়া নাড়িলে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। তিনি আমাকে দুয়ারে রাখিয়া আগে ভিতরে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একটী মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে ডাকিল, "আসুন মা, উপরে আসুন।"

আমি তাহার সহিত উপরে গিয়া দেখিলাম, দ্বিতলের বারণ্ডায় একখানি আসন পাতা আছে। স্ত্রীলোকটী আমাকে সেই আসনে বসিতে বলিয়া—নিজে মাটীতে বসিল।

আমি তখন তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার হাতে দুগাছি সোণার বালা, পরিধান একখানি রেশমী বোম্বাই শাড়ী, কিন্তু সধবার চিহ্ন সিন্দূর অথবা লোহ কিছুই নাই। দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল। কোন বিধবা যে এইরূপ প্রৌঢ় বয়সে অলঙ্কার ধারণ করিবেন অথবা বোম্বাই শাড়ী পরিবেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, অথচ এ রমণীর সধবার চিহ্ন সিঁথিতে সিঁদুর অথবা হাতে লোহাও নাই। এ তবে আমি কোথায় আসিলাম?

আমি সেই রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোকটী আসিয়াছিলেন, তিনি কোথায়?" রমণী বলিল, "তিনি ষ্টেশনে কাজ করেন, তাঁহার সময় নাই বলিয়া আপনাকে পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ বাড়ী কার?"

স্ত্রীলোকটী বলিল, "আপনি বর্দ্ধমানের বামা কীর্ত্তনীর কি নাম শুনিয়াছেন? আমি সেই বামা কীর্ত্তনী, এ বাড়ী আমার।"

স্ত্রীলোকটী এই কথা বলিবামাত্র আমার সম্মুখবর্ত্তী গৃহ ও গৃহসজ্জার দিকে দৃষ্টি পড়িল। আমি যে কোথায় আসিয়াছি, এতক্ষণে তাহা বুঝিলাম।

আমি বলিলাম, "মা, তোমার কল্যাণ হউক। আমি চলিলাম। তোমার গৃহে রাত্রিবাস করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইও না।" বলিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া কীর্ত্তনী আসিয়া আমার সম্মুখে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর যোড়হাত করিয়া নিতান্ত কাতরভাবে বলিল, "তুমি যে আমার গৃহে একরাত্রি বাস করিবে, এ আশা আমার নিতান্ত দুরাশা। আমি তোমাকে সে অনুরোধও করিতাম না। কিন্তু মা, আমি শুনিলাম বর্দ্ধমানে তুমি আজ নূতন আসিয়াছ, এখানে তোমার চেনা লোকও কেহ নাই। আজ একাদশী, তুমি সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছ। এইজন্য আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আজিকার রাত্রি তুমি এখানে থাকিয়া আমার গৃহ পবিত্র ও আমাকে উদ্ধার কর। মা, তুমি যাঁর পূজা কর, তিনি তো পতিতপাবন; তবে তোমার পতিতকে এত ঘৃণা কেন মা?"

কীর্ত্তনী এমন আন্তরিক ভাবে করুণস্বরে এই কথাগুলি বলিল যে, শুনিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, আমি তাহা নিবারণ করিতে পারিলাম না।

কীর্ত্তনী আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, দেখিলাম, তাহার চোখেও জল আসিয়াছে। গদ্‌গদ্ স্বরে বলিল, "মা, আমি নিতান্ত হীনা, কি দিয়া তোমার আতিথ্য সৎকার করিব জানিনা। তুমি যদি দয়া করিয়া আজ এ গৃহে থাক,তবে আমি রাত্রে তোমাকে কীর্ত্তন গাহিয়া শুনাইয়া আমার জীবন সার্থক করিব—ইহাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।"

পিপাসায় আমার প্রাণে দাবানল জ্বলিতেছে, কে তুমি মা তাহাতে শীতল বারি ঢালিবার আশা দিতেছ? আর আমি কোথায় যাইব? সেই শীতল বারাণ্ডায় শয়ন করিয়া সারারাত্রি কীর্ত্তনসুধা পান করিয়া শীতল হইলাম। সে যে কি মধুর কীর্ত্তন আমি জীবনে আর ভুলিতে পারিবনা। কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে কীর্ত্তনী কখনও চোখের জলে ভাসিতেছে, আবার কখনও তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সুরের ঝঙ্কারে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতেছে। ক্রমে যেন সমস্তই নিস্তরঙ্গ

একাকার হইয়া গেল। কোথায় আছি তাহা আর মনে রহিল না। কোথা দিয়া রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। যেন এক নিমেষে রাত্রি ফুরাইয়া গেল।

প্রভাতের অরুণালোকে চারিদিক্ যখন আলোকিত হইল, তখন কীর্ত্তনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে কীর্ত্তন শেষ করিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণে ও রোদনে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহার মুখের যে কি শোভা, আমার তখন তাহাকে দেখিয়া আর মানবী বলিয়া মনে হইল না। যেন কোন ব্রজবালা ছলনা করিয়া এই বেশ ধারণ করিয়াছেন। কীর্ত্তনী আমাকে বলিল, "মা, কাল তুমি উপবাসী আছ, আজ অনাহারে কেমন করিয়া তোমাকে বিদায় দিব। যদি কীর্ত্তন শুনিয়া আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে দয়া করিয়া আজ এখানে অন্নগ্রহণ কর।"

কীর্ত্তনীর কথা শুনিয়া সহসা আমার জননীর কথা মনে পড়িল। মা বার বার বলিতেন, "বেশ্যার ও বিষয়ীর অন্নগ্রহণ করিলে দ্বাদশ বৎসর কৃষ্ণভক্তির উদয় হয় না।" মা যাহা বলিতেন, তাহা আমি ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিতাম। জানিতাম—মার কথা কখনও মিথ্যা হয় না।

কিন্তু এখন আমি কি করিব? আজ যিনি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া আমাকে এই কীর্ত্তনসুধা পান করাইলেন, তাঁহার সকাতর অনুনয় আমি কেমন করিয়া উপেক্ষা করিব? কেমন করিয়া বলিব, "তুমি পতিতা, তোমার গৃহে আমি অন্নগ্রহণ করিতে পারিব না।" ইনি পতিতা?—একথা যে আমি মনেও ধারণ করিতে পারি না। আমার এখন মনে হইতেছে যে, ইহার পদধূলিতে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিলে বুঝি বা আমার শ্মশানহৃদয়েও কৃষ্ণপ্রেমমন্দাকিনী প্রবাহিত হইবে। কৃষ্ণলীলামৃতসমুদ্রে যার চিত্ত দিবানিশি মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সে কি আবার পতিতা হয়? তার কি আবার পাপ পুণ্য থাকে?

তবুও জননীর কথা বার বার মনে বাজিতে লাগিল। তাহাও ভুলিতে পারি না। মা যখন এ কথা বলিতেন, তখন তো কোন দিন মন দিয়া সে কথা শুনি নাই। এতদিন পরে আজ সহসাই বা কেন সে কথা মনে পড়িল! শ্যামসুন্দর, আজ তুমি আমাকে একি বিষম পরীক্ষায় ফেলিলে!

আমি যে মনে মনে ইতস্ততঃ করিতেছি, কীর্ত্তনী তাহা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া বলিলেন, "মা, তবে কি পতিতার—তোমার সেবা করিবার ভাগ্য হইবে না?" এমন করুণস্বরে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল যে, আমার মনের বাঁধ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। "দ্বাদশ বৎসর কৃষ্ণভক্তি হইবে না," না হউক, তবুও আমি এখানেই অন্নগ্রহণ করিব। মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বলিলাম, "মা, আমার জন্য কিছু চাল ও রন্ধন করিবার একটী নির্জ্জন স্থান দিবে। সেখানে আমি রন্ধন করিয়া লইব।"

কীর্ত্তনীর বাড়ীর কাছে একটা পুকুর ছিল, সেখানে স্নান করিয়া আসিলাম। তাহার কাছেই একখানি ছোট ঘর। স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলাম, সেখানে রন্ধনের দ্রব্যাদি ও একখানি নূতন কাপড় আছে। কাপড় ছাড়িয়া সেই কাপড় পরিলাম। রন্ধন করিয়া যখন শ্যামসুন্দরকে নিবেদন করিতে গেলাম, তখন দেখিলাম, অন্নের ভিতর একগাছি চুল আছে। সে অন্ন আর শ্যামসুন্দরকে নিবেদন করা হইল না। কীর্ত্তনী জানিতে পারিলে দুঃখিত হইবেন জানিয়া মালসা সহিত অন্ন পুকুরের জলে ডুবাইয়া দিলাম ও তাহার পর কীর্ত্তনীর নিকট বিদায় লইয়া তাহার বাটী হইতে বাহির হইলাম।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজাচার্য্যের আপত্তি-খণ্ডন।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আচার্য্য অদ্বৈতবাদীর দুইটী পরস্পরবিরোধী কথা পাশাপাশি বলিয়া প্রথম কথার উত্তর দিলেন, অপরটীর উত্তর তথায় দেন নাই। এক্ষণে এই বিচারে সেই অংশটীর উত্তর দিতেছেন। পরন্তু ইহার উত্তরটী বিচার করিবার পূর্ব্বে তিনি যে ভাবে ইহার আকৃতি

পরিবর্ত্তন করিলেন, তাহার প্রতি একটু দৃষ্টি করা আবশ্যক। তিনি যে অংশটীর উত্তর দেন নাই, তাহা এই—"জাতেঽপি সর্ব্বস্য সহসৈব ভেদ-জ্ঞানানিবৃত্তি ন দোষায়, চন্দ্রৈকত্বে জ্ঞাতেঽপি দ্বিচন্দ্রজ্ঞানানিবৃত্তিবৎ, অনি-বৃত্তমপি ছিন্নমূলত্বেন ন বন্ধায় ভবতীতি।" অর্থাৎ "আর অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান হইলেও (ভেদবাসনা-বশতঃ) সহসা সকলের ভেদজ্ঞান নিবৃত্তি না হইলে দোষ হয় না, কারণ, এক-চন্দ্র-জ্ঞান থাকিলেও দ্বিচন্দ্র-জ্ঞান হইতে দেখা যায়। ভেদজ্ঞান অনিবৃত্ত হইলেও ছিন্নমূল হইয়া যাওয়ায় বন্ধের নিমিত্ত হয় না।" ইত্যাদি। এখন এইটীকে আচার্য্য উত্তর দিবার কালে যেরূপ আকার প্রদান করিলেন, তাহা এই :—"সত্যপি বাক্যার্থজ্ঞানে অনাদিবাসনয়া মাত্রয়া ভেদজ্ঞানম্ অনুবর্ত্ততে ইতি ভবতা ন শক্যতে বক্তুম্।" অর্থাৎ "আর ('তত্ত্বমসি' ইত্যাদি) বাক্যের অর্থজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে অনাদি বাসনাবশতঃ কিয়ৎ পরিমাণে ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়, ইহাও তুমি বলিতে পার না।" ইত্যাদি। এইখানে এইটুকু লক্ষ্য করিবার জিনিষ যে, বাসনা শব্দে পূর্ব্বের প্রসঙ্গে কোন বিশেষণ ছিল না, এখন তাহাতে "অনাদি" এই বিশেষণটী আসিয়া বসিল, এবং উপরে "সহসা সকলের ভেদজ্ঞানের অনিবৃত্তি দোষের নহে" এই কথা ছিল,এস্থলে "কিয়ৎপরিমাণে ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়" এই কথাগুলি আসিল। ইহার গূঢ় রহস্য পাঠক ক্রমে বিদিত হইবেন। তবে এস্থলে এইটুকু বলা ভাল যে, বাসনাটীকে অনাদি বলিয়া তিনি পরে বলিবেন যে, "অনাদি বাসনা কখন অল্পদিনের অভ্যাসে ক্ষয় হইতে পারে না" ইত্যাদি। তাহার পর "সহসা সকলের নিবৃত্তি না হওয়া" এই অংশটুকুর পরিবর্ত্তে "কিয়ৎপরিমাণে অনুবৃত্তি হয়," এই কথাটী পরে গ্রহণ করিয়া, তিনি একটু সাবধান হইলেন মাত্র। কারণ, "সহসা নিবৃত্তি না হওয়া" এবং "কিয়ৎপরিমাণে অনুবৃত্তি হওয়া" ইহারা সর্ব্বত্র এক জিনিষ নাও হইতে পারে। কারণ, সহসা শব্দে হঠাৎ বা অকারণ এই অর্থ বোধ হয়, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে শব্দে পরিমাণই বুঝায়, ঠিক হঠাৎ বা অকারণ অর্থ বুঝায় না। তদ্ব্যতীত মূলের "সর্ব্বস্য" পদের অর্থ "সকল লোকের।" বস্তুতঃ ইহাতে প্রকারান্তরে অদ্বৈতবাদীর পক্ষই সমর্থিত হইয়া যায়। কারণ, ওরূপ স্থলে কোন কোন ব্যক্তিরও যদি

ভেদজ্ঞান সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদীর মতে দৃষ্টান্তের অভাব হইল না, আর যেখানে ব্যক্তিবিশেষে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না, সে স্থলে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক বা অপূর্ণতা স্বীকার করিলেই, বিপক্ষের কোন কথা বলিবার হেতু থাকিতে পারে না। তাহার পর অনুবৃত্তি শব্দে ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াও তাহার পুনরাগমন বুঝায়, কিন্তু ভেদ-জ্ঞানের অনিবৃত্তি শব্দে উহার নিবৃত্তি আদৌ বুঝাইতে পারে না। বলা বাহুল্য, অদ্বৈতবাদীর মতে বেদান্তবাক্যার্থজ্ঞানে ভেদজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু মূল কারণ অবিদ্যার সম্পূর্ণ নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত (উক্ত অবিদ্যানাশক জ্ঞান সত্ত্বেও) মধ্যে মধ্যে ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। যেহেতু দেহাদিও উক্ত অবিদ্যারই ভিন্নরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা হউক, এসব পরের কথা, ইহা যথাস্থানে সবিস্তারে কথিত হইবে। এখন দেখা যাউক, আচার্য্যের উত্তরটী কিরূপ হইল। ইহার উত্তর আচার্য্য স্তবকে স্তবকে দিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম স্তবকটী এই—

"আর বাক্যার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে অনাদি বাসনাবশতঃ কিয়ৎ-পরিমাণে ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়, ইহাও তুমি বলিতে পার না।

"কারণ, ভেদজ্ঞান যখন মিথ্যা, তখন জ্ঞানের উৎপত্তি মাত্রেই তৎকারণ ভেদবাসনারও নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে।" ইত্যাদি।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন—কথাটা আমাদের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ভেদজ্ঞানটা মিথ্যা বলিয়া ভেদজ্ঞাননিবারক জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই ভেদজ্ঞানের একটী কারণ যে ভেদসংস্কার, তাহাও যে নিবৃত্ত হইবে, ইহার কোন কারণ নাই। কার্য্যনাশের পূর্ব্বে সমুদায় কারণের নাশ না স্বীকার করিলে, একথা ত বলিতে পারা যায় না। অবশ্য কার্য্যনাশে সমবায়ী অথবা অসমবায়ী, অথবা উভয় কারণের নাশ অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু তাই বলিয়া নিমিত্ত কারণের নাশও অবশ্যম্ভাবী হইবে কেন? তন্তু-সংযোগ-নাশে পটনাশ হয়, তন্তু-নাশেও পট নষ্ট হয়, তন্তু এবং তাহার সংযোগ উভয়ের নাশেও পট নষ্ট হয়, কিন্তু তন্তুবায় বা তুরী-ভেরীর নাশ আবশ্যক হয় না। সুতরাং কার্য্যনাশে কারণনাশ—

একথা ওরূপ সাধারণ ভাবে বলা চলে না। তিনি আমাদের মুখ দিয়া যাহা বাহির করিয়াছেন, তাহাতে ভেদজ্ঞান কার্য্য, ভেদসংস্কার হইল নিমিত্ত কারণ; সুতরাং বেদান্তবাক্য-জন্য জ্ঞানে ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, ভেদসংস্কারও নিবৃত্ত হইতে পারে না। আর একথা অস্বীকার করিলে, ঘট ভাঙ্গিলে কুম্ভকারের দণ্ডচক্র প্রভৃতি পর্য্যন্ত নষ্ট হইবে, বলিতে হয়। সুতরাং আচার্য্যের একথাগুলির সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারিল না।

তাহার পর, পূর্ব্বে যে কথা আরম্ভ করা হইয়াছে,যথা, "ভেদবাসনায়াম্ অনিরস্তায়াং বাক্যং অবিদ্যানিবর্ত্তকং জ্ঞানং ন জনয়তি" তাহাতে ত বেদান্তবাক্যার্থ হইতে অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান হইবারই কথা উঠিয়াছে, ভেদসংস্কারের নিবৃত্তির কথা ত উঠে নাই, ভেদসংস্কারকে তথায় প্রতিবন্ধক বলাই হইয়াছে। সুতরাং "ভেদজ্ঞান যখন মিথ্যা, তখন জ্ঞানের উৎপত্তি মাত্রেই তৎকারণ ভেদবাসনারও নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে," আচার্য্যের এই কথাটী নিরর্থক হইয়া পড়িতেছে। আর যদি বলা হয়, মিথ্যাসম্বন্ধীয় কথা বলিয়া কার্য্যনাশে কারণের নাশ হওয়া উচিত, তাহাও বলা যায় না; যেহেতু মিথ্যার কারণ যে "মিথ্যা", তাহা তাহার "কার্য্য মিথ্যা" অপেক্ষা নিত্য বা স্থায়ী বলিতে হইবে। "কার্য্য অপেক্ষা কারণ স্থায়ী" এ নিয়মটী মিথ্যার স্থলে অন্যথাভূত হইতে বাধ্য, এমন কোন হেতু নাই। যাহা হউক অদ্বৈতবাদীর এই প্রকার উত্তর আশঙ্কা করিয়া আচার্য্য পরবর্ত্তী বাক্যে তাহারও খণ্ডন করিতেছেন। তিনি বলেন, এস্থলে বেদান্তের বাক্যার্থে অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞানোৎপত্তির কথা হইলেও সেই সঙ্গে উহার প্রতিবন্ধক ভেদসংস্কারের নিবৃত্তির কথাও প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িতেছে। যেহেতু বেদান্তবাক্যার্থ দ্বারা যখন উক্তপ্রকার জ্ঞানোৎপত্তি ইচ্ছা করা হইতেছে, তখন বেদান্তবাক্যকে তাহার উৎপাদ্য জ্ঞানের প্রতিবন্ধককে নষ্ট করিয়াই সে জ্ঞান উৎপাদন করিতে হইবে। নচেৎ উক্ত জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি তাহার কারণতাই থাকে না।

এ সম্বন্ধে আচার্য্যের নিজের কথাটী এই ঃ—

"জ্ঞানোৎপত্তৌ অপি মিথ্যারূপায়াঃ তস্যা অনিবৃত্তৌ নিবর্ত্তকান্তরাভাবাৎ কদাচিদপি নাস্যা বাসনায়াঃ নিবৃত্তিঃ।"

অর্থাৎ—"বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও, যদি মিথ্যাময়ী সেই ভেদবাসনা নিবৃত্ত না হয়, তবে জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও নিবারক উপায় না থাকায়, কখনও সেই বাসনার নিবৃত্তি হইতে পারে না।" ইত্যাদি। এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলিবেন—আচার্য্যের একথাটী খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক, কিন্তু তাহা হইলেও উহা প্রকৃত উত্তর-মধ্যে গণ্য হইতে পারে না; কারণ, সংস্কার-নাশে সংস্কারের কারণতা থাকাই যুক্তিসিদ্ধ। ভেদসংস্কারের নাশে তত্ত্বজ্ঞানের সংস্কারই আবশ্যক হইবে, আর ভেদজ্ঞান-নাশে তত্ত্বজ্ঞানেরই কারণতা প্রয়োজনীয় হইবে। যে ব্যক্তির ভেদসংস্কার আছে, সে ব্যক্তি যদি তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের সংস্কার উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে তখন তাহার ভেদসংস্কারও নষ্ট হইবে। পরন্তু ভেদজ্ঞান-নিবারক জ্ঞানে ভেদসংস্কার নষ্ট হইতে পারে না। মোট কথা, তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও, যদি মিথ্যাময়ী সেই ভেদবাসনা নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ এবং মনন-রূপ জ্ঞানানুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহাতে তত্ত্বজ্ঞানের সংস্কার জন্মে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বদ্ধমূল হইয়া আসে, আর তখন সেই ভেদবাসনার নিবৃত্তি হইয়া যায়। এই বাসনার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইতে গেলে দেহনাশ কিংবা সমাধি-সিদ্ধি প্রয়োজন। সমাধি-সিদ্ধি না ঘটিলে, যতদিন দেহ থাকে, ততদিন ভেদ-সংস্কার সম্পূর্ণরূপে যায় না বলিয়া, কখন কখন ভেদজ্ঞান উদয় হয় বটে, কিন্তু তখনই আবার তৎপশ্চাতে উহা যে মিথ্যা, এ জ্ঞানও উদয় হয়; সুতরাং এই ভেদজ্ঞানের ব্যবহারে আর বন্ধন হয় না, অর্থাৎ আর নূতন ভেদজ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। এস্থলে বেদান্তবাক্যার্থ শ্রবণ-জন্য জ্ঞানেরই দৃঢ়তাসাধন ও প্রবাহ রক্ষার জন্য মননাদিরূপ জ্ঞানানুষ্ঠান আবশ্যক হয়। সংশয় প্রভৃতি বিপরীত ভাবনার ক্ষয়ে সেই জ্ঞানই প্রকাশ পায়, অন্য কোন প্রকার জ্ঞান জন্মে না; আর যদি বলা হয়—"এই জ্ঞানা-নুষ্ঠান বা জ্ঞানাভ্যাসই আচার্য্যের মতে কর্ম্ম; কারণ, জানা ও জানা

বিষয়ের আলোচনা এক জিনিষ নহে। সুতরাং আমাদের মতে জ্ঞানসংস্কার দ্বারা ভেদজ্ঞানের সংস্কারনাশে জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদই সিদ্ধ হয়।" তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হয় না। কারণ, জ্ঞানানুষ্ঠান-ক্রিয়াতে "আমি কর্ত্তা বা অধিকারী" এইরূপ জ্ঞান, অথবা অগ্নি-হবিঃ-কাষ্ঠ প্রভৃতির আবশ্যকতা নাই এবং তজ্জন্য অর্থোপার্জ্জন ও সমুদয় আশ্রমধর্ম্মের জন্য বিবাহাদির প্রয়োজন নাই; কেবল সন্ন্যাসাশ্রমেই এ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। সকলেই জানে—গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ম্ম ও সন্ন্যাসাশ্রমের কর্ম্ম কখনই এক নহে। এইজন্য বলি—জ্ঞানাভ্যাস ও যজ্ঞদানাদি যদি এ উভয়কেই কর্ম্ম বলিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এ দুই প্রকার কর্ম্মের মধ্যে যে ভেদ থাকিবে, তাহা আকাশ পাতালের ভেদ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং কথিত যুক্তি দ্বারা আচার্য্য আমাদের মত খণ্ডন করিতে পারিতেছেন না, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

যাহা হউক, কিন্তু আচার্য্যের পরবর্ত্তী কথা শুনিয়া মনে হয়, আচার্য্য অদ্বৈতবাদীর এই সব কথা ভাবিয়া থাকিবেন এবং তজ্জন্য উক্তপ্রকার উত্তর দিয়া তিনি তৃপ্ত হইতে পারিলেন না এবং তজ্জন্য তিনি পুনরায় অদ্বৈতবাদীর উক্ত কথাটীর অন্য প্রকারে উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই উত্তরটীকে আমরা তাঁহার উত্তরের তৃতীয় স্তবক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

"বাসনাকার্য্যং ভেদজ্ঞানং ছিন্নমূলং অথচানুবর্ত্তত ইতি বালিশ-ভাষিতম্। দ্বিচন্দ্রজ্ঞানাদৌ তু বাধকসন্নিধাবপি মিথ্যাজ্ঞানহেতোঃ পরমার্থ-তিমিরাদিদোষস্য জ্ঞানবাধ্যত্বাভাবেনাবিনষ্টত্বান্মিথ্যাজ্ঞানানিবৃত্তিরবিরুদ্ধা, প্রবলপ্রমাণবাধিতত্বেন ভয়াদিকার্য্যং তু নিবর্ত্ততে।"

অর্থাৎ—"ভেদজ্ঞানের মূল কারণ বাসনা, সেই বাসনা বিনষ্ট হইল, অথচ তৎকার্য্য ভেদজ্ঞান চলিতে থাকিল, ইহা মূঢ়ের কথা। দ্বিচন্দ্রাদি দর্শনস্থলে কিন্তু ভ্রমের বাধক (জ্ঞান) সন্নিহিত থাকিলেও, ঐ ভ্রমের যথার্থ কারণ তিমিরাদি (অর্থাৎ রোগবিশেষ) দোষ বিনষ্ট হয় না; কারণ, উহা সত্য, সুতরাং সে ভ্রম তাদৃশ জ্ঞানের নিবার্য্য নহে;

সুতরাংই (সে স্থানে) মিথ্যাজ্ঞানের অনিবৃত্তি, বিরুদ্ধ বা দোষাবহ নহে, পরন্তু (সে স্থলেও আপ্তোপদেশাদি) প্রবল (নিঃসংশয়) প্রমাণ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, অর্থাৎ 'ইহা সত্য নহে—মিথ্যা' এইরূপ নিশ্চয়-বশতঃ ভ্রমসম্ভূত ভয়াদি কার্য্য নিবৃত্ত হইয়া যায়।" এতদুত্তরে আমরা বলি, আচার্য্যের কথাগুলি বড়ই বিচিত্র। প্রথমতঃ দেখা যায়, তাঁহার এই বিচারের মূলমন্ত্র এই যে, "কারণনাশে কার্য্যনাশ অবশ্যম্ভাবী।" ইহা যে না স্বীকার করিবে সে, নিশ্চয়ই মূঢ়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা, আমরা কোথায় বলিয়াছি যে, ভেদজ্ঞানের মূল কারণ ভেদ-সংস্কার অথবা সেই সংস্কারের নাশ ভেদজ্ঞাননাশের অগ্রে হয়? আমরা বলি, অবিদ্যা হইতে আমি-তুমি-রূপী আত্মা অনাত্মা বোধ হয়, এই আত্মাই দ্রষ্টা, আর এই অনাত্মাই দৃশ্য। এই দ্রষ্টা-দৃশ্যের সংযোগে জ্ঞান হয়, এজন্য এই জ্ঞানে ভেদই বর্ত্তমান থাকে, আর এইজন্যই বলা হয়—অবিদ্যা হইতে ভেদজ্ঞান হয়। তাহার পর এই ভেদজ্ঞানের ব্যবহারে ভেদসংস্কার হয় এবং এই ভেদসংস্কার হইতে আবার ভেদজ্ঞান হইতে থাকে; প্রভেদ এই যে, অবিদ্যা এই ভেদজ্ঞানের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, কিন্তু ভেদসংস্কারটী উক্ত ভেদজ্ঞানের নিমিত্ত কারণ হইয়া থাকে। তাহার পর এই ভেদজ্ঞানাদি-নাশের সময় বেদান্তবাক্যার্থ হইতে ভেদজ্ঞাননাশক জ্ঞান হয়, এ সময় উভয় জ্ঞানের সংগ্রাম চলিতে থাকে। আর উক্ত জ্ঞানের সংস্কার যত উৎপন্ন হয়, ততই ভেদসংস্কারের নাশ হয় এবং ক্রমে এতদুভয়ের নাশে অবিদ্যা নিবৃত্তি হয়। সুতরাং আমাদের এই কথা হইতে আচার্য্য কি করিয়া বলিতে পারেন যে, "ভেদজ্ঞানের মূল কারণ বাসনা, সেই বাসনা বিনষ্ট হইল, অথচ ভেদজ্ঞান চলিতে থাকিল, ইহা মূঢ়ের কথা" ইত্যাদি। তিনি আমাদের মুখ দিয়া যাহা বাহির করাইয়াছেন, তাহাতে আছে—

"ন চ বাচ্যং ভেদবাসনায়াম্ অনিবৃত্তায়াং বাক্যম্ অবিদ্যানিবর্ত্তকং জ্ঞানং ন জনয়তি, জাতেঽপি সর্ব্বজ্ঞে সহসৈব ভেদজ্ঞানানিবৃত্তির্ন দোষায়; চন্দ্রৈকত্বে জাতেঽপি দ্বিচন্দ্রজ্ঞানানিবৃত্তিবৎ, অনিবৃত্তমপি ছিন্নমূলত্বেন ন বন্ধায় ভবতি।"

অর্থাৎ—"ভেদবাসনা নিরস্ত না হইলে বাক্য অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান জন্মাইতে পারে না, একথাও বলা যায় না। আর উক্ত জ্ঞান জন্মিলেও, সকলের সহসা ভেদজ্ঞানের অনিবৃত্তি দোষাবহ নহে, যেমন চন্দ্র এক জানিলেও দ্বিচন্দ্রজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না। আর অনিবৃত্ত হইলেও, ছিন্নমূল হওয়ায়, বন্ধের কারণ হয় না।" ইত্যাদি।

এখানে দেখা যায়, "জাতেঽপি সর্ব্বস্য সহসৈব ভেদজ্ঞানানিবৃত্তির্ন দোষায়" অর্থাৎ "অবিদ্যানিবারক জ্ঞান হইলেও, সকলের সহসা ভেদজ্ঞানের অনিবৃত্তি দোষের নয়" এই কথা বলায় অবিদ্যানিবারক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যার নিবৃত্তি বুঝায় না, অথবা ভেদজ্ঞান-নাশের পূর্ব্বে যে ভেদবাসনা নিবৃত্তি হইয়াছে, তাহাও বুঝায় না; অথচ উত্তর দিবার কালে এই ভেদবাসনা নিবৃত্তি হইল, অথচ ভেদজ্ঞান নিবৃত্তি হইল না, একথা যাহারা বলে, তাহারা মূঢ়, ইহা বলা হইল। অবিদ্যানিবারক জ্ঞান হইলেও অবিদ্যা থাকিতে পারে, ইহার কারণ ইহাদের উভয়ের মাত্রাভেদ। ইহারই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার জন্য আমরা একচন্দ্র ও দ্বিচন্দ্রজ্ঞানের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকি। আর ভেদজ্ঞান হইতে ভেদসংস্কারটী সূক্ষ্ম বলিয়া, ভেদজ্ঞাননাশেও ভেদসংস্কারনাশ সম্ভব নহে। ইহা সকলেই নিজে নিজে অনুভব করিতে পারেন, সুতরাং এজন্য যুক্তি বা দৃষ্টান্তের আবশ্যকতা নাই। ফলে এই জন্যই বলি, আচার্য্যের এই উত্তরটী সঙ্গত হইতে পারে না।

আর যদি বলা হয়, "জাতেঽপি" এই শব্দে ভেদবাসনা নিবৃত্তি-পূর্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তির কথাই আচার্য্যের অভিপ্রেত, যেহেতু "জাতেঽপি" এই শব্দের পূর্ব্বেই "ভেদবাসনায়াম্ অনিরস্তায়াং" অর্থাৎ "ভেদ-বাসনা নিরস্ত না হইলে জ্ঞান হয় না" এই কথা বলা হইয়াছে, সুতরাং অগ্রে বাসনানাশ, পরে ভেদজ্ঞানের নাশ মনে উদয় হইবার কথা, তাহা হইলে বলিব, "বাসনা নাশ হইল, অথচ ভেদজ্ঞান নাশ হইল না, ইহা মূঢ়ের কথা"—আচার্য্যের এই বাক্যটী সে স্থলে সঙ্গত বটে, কিন্তু তাহা হইলে সে স্থলেও "জ্ঞান হয় না" একথা আমরা বলি না,

প্রত্যুত সে স্থলে "জ্ঞান হয়ই" ইহাই আমরা বলিব। অর্থাৎ বেদান্ত বাক্যার্থ দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তিকারক জ্ঞানোৎপত্তি এবং তাহার অভ্যাস-দ্বারা ভেদসংস্কার নিবৃত্তি হইলে ভেদজ্ঞান আর থাকে না এবং তাহার অনুবৃত্তিও হয় না। ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি হইতে গেলে ভেদজ্ঞানের কারণ অবিদ্যা বা অবিদ্যাজাত দেহ এবং ভেদসংস্কার থাকা দরকার। যেহেতু কারণ বিনা কার্য্য হয় না, একথা আমরাও বলি। পরন্তু আচার্য্য-বাক্যের এরূপ অভিপ্রায় গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে, আচার্য্য প্রতি-পক্ষকে মূঢ় বলিবেন বলিয়াই "ভেদবাসনা থাকিতে জ্ঞান হয় না" বলিয়াই তাহার পার্শ্বেই আবার বলিলেন, "আর হইলেও ভেদজ্ঞানের অনিবৃত্তি দোযাবহ নহে" ইত্যাদি, নচেৎ এরূপ দুইটী বাক্যের একত্র সমাবেশের কোন আবশ্যকতা নাই। ফলে ইহা যেমন আচার্য্যের অত্যুত্তম সূক্ষ্ম-বুদ্ধির পরিচায়ক, তদ্রূপ তাহার অপূর্ব্ব অপব্যবহারেরও দৃষ্টান্ত। তাহার পর 'ভেদবাসনায়াম্ অনিরস্তায়াং বাক্যম্ অবিদ্যানিবর্ত্তকং জ্ঞানং ন জনয়তি' এই কথায় ভেদবাসনা, ভেদজ্ঞানের মূল কারণ হইতেছে না। মূল কারণ হইতে গেলে সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ হওয়াই উচিত। সুতরাং ভেদবাসনানাশের পর বেদান্তবাক্য অবিদ্যানিবর্ত্তক জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তি করে বলিয়া, ভেদবাসনা ভেদজ্ঞানের নিমিত্তকারণই হইতে বাধ্য। এখন জিজ্ঞাসা করি, ভেদজ্ঞানরূপ কার্য্যনাশের জন্য ভেদজ্ঞানের পূর্ব্বে ভেদজ্ঞানের এই নিমিত্ত কারণ ভেদবাসনাটীরও কি নাশ হওয়া আবশ্যক হইবে ? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে সেই পূর্ব্বের কথা আবার বলিব—ঘট নষ্ট হইবার পূর্ব্বে কুম্ভকার ও তাহার দণ্ডচক্রের নাশ হওয়া আবশ্যক নহে কি ?

যদি বলা হয়, অবিদ্যা যখন ভেদজ্ঞান ও ভেদসংস্কার এই উভয়েরই মূল কারণ, তখন বেদান্তবাক্যদ্বারা অবিদ্যার নাশ স্বীকার করিলে, উহা ভেদসংস্কারকে নাশ করিয়াই ভেদজ্ঞানকে নষ্ট করিবে, তাহাতে বাধা কি ? সত্য। কিন্তু আমরা ত তাহা স্বীকার করি না। আমরা বলি, বেদান্তবাক্য দ্বারা অবিদ্যানিবারক জ্ঞান জন্মে, এই জ্ঞানের সময়ও অবিদ্যা থাকে, ক্রমে ভোগ দ্বারা যতই প্রারব্ধ প্রতিবন্ধক ক্ষয় হয়

ততই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে থাকে। ইহার প্রমাণ আচার্য্যেরই কথা। তিনি পূর্ব্বপক্ষে আমাদের মত বর্ণনকালে যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি যদি দৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে সেখানে দেখা যাইবে যে, আচার্য্য আমাদের কথা ঠিক ঠিক বলিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় খণ্ডনকালে উহা অন্যরূপ হইয়া গেল। যথা—

শ্রবণং নাম বেদান্তবাক্যানি আত্মৈক্যবিদ্যাপ্রতিপাদকানীতি তত্ত্বদর্শিনঃ আচার্য্যাৎ ন্যায়যুক্তার্থগ্রহণম্। এবং আচার্য্যোপদিষ্টস্য অর্থস্য স্বাত্মনি এবমেব যুক্তম্ ইতি হেতুতঃ প্রতিষ্ঠাপনং মননম্। এতদ্বিরোধি-অনাদিভেদবাসনা-নিরসনায় অস্য অর্থস্য অনবরতভাবনা নিদিধ্যাসনম্। এবং শ্রবণমননাদিভিঃ নিরস্ত-সমস্ত-ভেদবাসনস্য বাক্যার্থজ্ঞানম্ অবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তি ইতি।

অর্থাৎ—"তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট হইতে 'বেদান্তবাক্য সকল আত্মৈকত্বজ্ঞানপ্রতিপাদক,' এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্যার্থের গ্রহণকে শ্রবণ বলে। এইরূপ আচার্য্যোপদিষ্ট বিষয়ের, এই এই কারণে ইহা নিশ্চিতই যুক্তিযুক্ত, এইরূপ বিচার দ্বারা নিজ হৃদয়ে দৃঢ় রূপে ধারণ করার নাম মনন। এই একত্বজ্ঞানের প্রতিপক্ষ অনাদি ভেদবুদ্ধি ও তৎসংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত অনবরত ঐ বিষয়ের ভাবনার নাম নিদিধ্যাসন। এই রূপে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা যাহার সমস্ত ভেদবাসনা অপনীত হইয়াছে, ('তত্ত্বমসি' ইত্যাদি) বাক্যজনিত জ্ঞান তাহারই অবিদ্যা-নিবৃত্তি করে।" এখানে ভেদসংস্কার নাশ হইলে অবিদ্যা নিবৃত্তির কথা রহিয়াছে, অবিদ্যানিবৃত্তির পর ভেদজ্ঞানের নাশের কথা হইতেছে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের মত খণ্ডনকালে তিনি ভেদবাসনার নিবৃত্তিতে ভেদজ্ঞান-নিবৃত্তির কথা বলিয়া, আমাদিগকে মূঢ় বলিয়া ফেলিলেন। এস্থলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কথা বলিলে, আমা-দের এত কথা বলিবার আবশ্যকতা হইত না।

আর যদি বলা হয়, আচার্য্য ভেদসংস্কার ও অবিদ্যাকে এস্থলে এক করিয়া উক্ত কথা বলিতেছেন, তাহা হইলে বলিব, তাঁহার পূর্ব্ববাক্যই অসঙ্গত হইল অর্থাৎ "ভেদবাসনায়াম্ অনিরস্তায়াং বাক্যং অবিদ্যানিবর্ত্তকং জ্ঞানং ন জনয়তি" এই কথাটী নিরর্থক হয়। কারণ, এই বাক্যে

ভেদবাসনারূপ প্রতিবন্ধক ও অবিদ্যারূপ মূল কারণটী পৃথক্ হইয়া পড়িতেছে। আর যদি বলা হয়, পূর্ব্ব বাক্যের সঙ্গে একথার কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং অবিদ্যা ও ভেদবাসনা এস্থলে একই ভাবিয়া আচার্য্য প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিতেছেন, তাহা হইলে বলিব ঃ—না, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ সে স্থলের দ্বিচন্দ্রাদি-দর্শনের দৃষ্টান্তের খণ্ডন, এই স্থলেই আচার্য্য করিতেছেন। সুতরাং বলিতে হইবে, এস্থলে আচার্য্য অবিদ্যাকে ভেদবাসনা বলিয়া বুঝিতেছেন না, আর তজ্জন্য কারণনাশে কার্য্যনাশ এই নিয়ম বলে তাঁহার এই উত্তরটীও ব্যর্থ হইয়া যাইল। ভেদ-সংস্কার নিমিত্তকারণ, সুতরাং তাহার নাশে ভেদজ্ঞান নষ্ট হইতে পারে না।

আর যদি পূর্ব্বোক্ত দোষ স্বীকার করিয়া ভেদবাসনাকেই আচার্য্য এস্থলে অবিদ্যা বলিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বেদান্তবাক্য দ্বারা ভেদবাসনা অর্থাৎ অবিদ্যা নষ্ট হয়, কিন্তু তখনও ভেদজ্ঞান অনুবৃত্ত হয়, এই কথাই আমাদের মুখ দিয়া বাহির করিয়া আমাদের কথা খণ্ডন করিতে চাহেন; তাহা হইলে বলিব, আচার্য্য আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে চাহেন না। যেহেতু আমরা বলি, ভেদবাসনা, ভেদজ্ঞানের নিমিত্তকারণ, এবং এই নিমিত্তকারণ বিনষ্ট হইলেও "কার্য্য" থাকিতে পারে, যেমন যে দণ্ড দ্বারা কুম্ভকারের চক্র ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, সেই দণ্ড তুলিয়া লইলেও চক্র কিয়ৎপরিমাণে ঘুরিতে থাকে। আর যদি বলা হয়, আচার্য্যমতে অবিদ্যা ও ভেদবাসনা এক বলিয়া, এই ভেদবাসনা ভেদজ্ঞানের উপাদান কারণ, সুতরাং ভেদবাসনাব নাশে ভেদজ্ঞান থাকে বলিলে কারণনাশে কার্য্যের সত্তা স্বীকার করা হইল, অগত্যা এ প্রকার মতবাদীকে মূঢ় বলা অসঙ্গত নহে, তাহা হইলে বলিব, আচার্য্য ঠিক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু তখন আর আমরা ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়—ইহা স্বীকার করি না। কারণ, সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যা নাশ হইতে গেলে দেহনাশ আবশ্যক। কারণ, দেহাদি অবিদ্যারই কার্য্য, এজন্য সাধক যাবজ্জীবন শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন অনুষ্ঠান করিয়া বা সমাধিস্থ হইয়া দেহনাশ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। আর এই নিদিধ্যাসনাদি অনুষ্ঠানকে কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় পক্ষ স্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, কর্ম্ম

বলিতে এমন কর্ম্মও বুঝায়, যাহা শ্রবণমননাদির বিপরীত। যেহেতু শ্রবণ-মননে সর্ব্ববিধ অভিমান পরিত্যাজ্য, এবং যাগ-যজ্ঞাদিতে আমি কর্ত্তা, আমি অধিকারী ইত্যাকার অভিমান আবশ্যক। তবে অবশ্য যতদিন অবিদ্যার কার্য্য ভেদজ্ঞানজাত ভেদসংস্কার এবং দেহ থাকে, ততদিন বেদান্তবাক্য দ্বারা অবিদ্যার অংশতঃ নাশ হয়। আর তজ্জন্য ভেদ-সংস্কারবশে ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়। এ সময় অবিদ্যার নাশ সম্পূর্ণ নাশ-পদবাচ্য হয় না। ইহারই দৃষ্টান্ত দিবার জন্য আমরা দিগ্‌ভ্রম ও দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকি। এ সময় ভেদজ্ঞান অনুবৃত্ত হইলেও, উহা যে মিথ্যা, সে জ্ঞানটী বিলুপ্ত হয় না; সুতরাং ভ্রষ্ট বীজের অঙ্কুরোদ্গম-সম্ভাবনা যেমন থাকে না, তদ্রূপ উহা বন্ধনের কারণ হয় না। যাহা হউক, আচার্য্য আমাদের এই দ্বিচন্দ্রদর্শন দৃষ্টান্তটীকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলেন, তাহাই এইবার আমাদের বিচার্য্য। আচার্য্য বলেন—অবিদ্যা-নিবারক জ্ঞান সত্ত্বেও যে অবিদ্যা থাকিতে পারে, তাহার জন্য এ দৃষ্টান্ত ঠিক নহে। কারণ, অদ্বৈতবাদীর মতে একচন্দ্রজ্ঞানরূপ বাধকজ্ঞান সত্ত্বেও, দ্বিচন্দ্রজ্ঞান অনুবৃত্ত হয়, সুতরাং অবিদ্যানিবারক জ্ঞানসত্ত্বেও অবিদ্যার কার্য্য ভেদজ্ঞান অনুবৃত্ত হয় ইত্যাদি। আচার্য্য বলেন—এ দৃষ্টান্তে দোষ রহিয়াছে। দেখ, এস্থলে দ্বিচন্দ্র দর্শনের হেতু তিমিররোগ; ঐ তিমিররোগ সত্য পদার্থ, আর সত্য বলিয়া একত্বজ্ঞান সত্ত্বেও দ্বিত্বজ্ঞান হয়। উহা যদি সত্য রোগ না হইত, তাহা হইলে একদিন বলা যাইতে পারিত যে, একত্বজ্ঞান হইলেও ভেদজ্ঞানের উদয় ঘটিতে পারে। অথচ এই অবস্থায় আপ্তোপদেশাদির দ্বারা দ্বিচন্দ্রজ্ঞানজনিত ভ্রান্ত ব্যবহার নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং বেদান্তবাক্যার্থজ্ঞান ইলেও, ভেদজ্ঞান থাকিবে, তবে তাহার জন্য শোকমোহ থাকিবে না ইত্যাদি। (মূল ও অনুবাদ ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।)

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন—আচার্য্য আমাদের অভিপ্রায়ের সন্নিহিত প্রদেশেও পদার্পণ করিতে চাহেন না, অথচ আমাদের মত খণ্ডন করিতে চাহেন। কারণ, এস্থলে দৃষ্টান্ত হইতেছে, একত্বজ্ঞানরূপ সত্য বাধকজ্ঞান সত্ত্বেও ভ্রমরূপ ভেদজ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়, এইটুকু অংশে,

উহার "হেতু" বা উহার জ্ঞানত্ব-অংশ দৃষ্টান্তের অংশ নহে। আমরা বলি—তিমিররোগবশতঃ দ্বিচন্দ্রকে সত্য যে ব্যক্তি বলে, সে ব্যক্তি একচন্দ্র সত্য এই জ্ঞান সত্ত্বেও প্রথম প্রথম দ্বিচন্দ্র সত্য মনে করিয়া ফেলে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তদ্রূপ ব্রহ্মেই জগৎ ভ্রম হয়, এ জ্ঞান সত্ত্বেও জগৎকে ব্রহ্ম ভিন্ন সত্য বলিয়া মধ্যে মধ্যে বোধ হয়। তাহার পর আসল কথা এই যে, তিমিররোগটা "দ্বিচন্দ্র সত্য" এই মিথ্যা জ্ঞানের হেতুই হইতে পারে না। তিমিররোগ দ্বিচন্দ্রজ্ঞানের "হেতু" হইতে পারে, পরন্তু "উহা সত্য" এ জ্ঞানের "হেতু" হইতে পারে না। কারণ, জন্মাবধি তিমিররোগাক্রান্ত ব্যক্তি লোকমুখে "দ্বিচন্দ্র মিথ্যা" না শুনা পর্য্যন্ত দ্বিচন্দ্রকে সত্য মনে করিতে পারে; কারণ, মানুষের স্বভাবই এই যে, জ্ঞান বাধিত না হইলে তাহা সে সত্যই মনে করে। কিন্তু একবার লোকমুখে "দ্বিচন্দ্র মিথ্যা" একথা শুনিলে, আবার তাহাকে যদি সত্য বোধ করে, তাহা হইলে তাহা কি কারণে হয়, বলিতে হইবে। তাহা কি তিমিররোগবশতঃ হয় অথবা যে কারণে লোকের ভ্রম হয়, সেই কারণেই হয়—বলিবে? উত্তরে নিশ্চয়ই এস্থলে বলিতে হইবে, ইহা মনের দোষে হয় অর্থাৎ মনে যে দ্বিচন্দ্রের সংস্কার থাকে, সেই সংস্কারের অপ-প্রয়োগবশতঃ হয়; তিমিররোগটী পরম্পরায় কারণ হইতে পারে, কিন্তু সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে না। সুতরাং এস্থলে সত্য তিমিররোগকে হেতু বলিয়া আচার্য্য অদ্বৈতবাদীর কথা খণ্ডন করিতে পারেন না। তিমিররোগ চক্ষুরিন্দ্রিয়ে হয়; ইন্দ্রিয়ের কার্য্য মনের নিকট বিষয়ের আকৃতি বহন করা, অথবা মতান্তরে নিজে পথস্বরূপ হইয়া বিষয়ে মনকে পতিত হইতে দেওয়া; সুতরাং বাধক জ্ঞান সত্ত্বেও যে ভ্রম-হেতু তাহা ইন্দ্রিয়ে থাকিতে পারে না, তাহা স্মৃতির স্থান মনে থাকে। সুতরাং আচার্য্যের এই বিপুলায়তন বিচারটী ব্যর্থ।

আর যদি কেহ এস্থলে বলিতে চাহেন যে, আচার্য্য অদ্বৈতবাদীর এই দ্বিচন্দ্রদর্শন দৃষ্টান্তটী অবলম্বন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা জ্ঞানের মিথ্যাত্ব অংশে নহে, পরন্তু তাহা জ্ঞানের জ্ঞানাংশকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, তাহা হইলেও অদ্বৈতবাদী বলেন,—আমরা তাহাতেও পশ্চাৎপদ

নহি; আমরা এস্থলেও ইহার সমুচিত উত্তর দিতে সক্ষম। তাঁহারা যে বলেন—তিমিররোগটী সত্য বলিয়া তিমিররোগাক্রান্ত ব্যক্তির দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়, ইহা আমরাও স্বীকার করি, এবং সে স্থলে দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানের সাক্ষাৎ কারণই তিমিররোগ, তাহাও বলিতে সম্মত আছি; কিন্তু যদি "ভাবনার বিষয়টী স্থূল চক্ষে পরিদৃষ্ট না হইলেও ভাবনার প্রাবল্যে তাহা তদ্রূপে প্রত্যক্ষ হয়" একথা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে দ্বিচন্দ্রদর্শনস্থলে একচন্দ্রের ভাবনাকে প্রবল করিয়া তুলিতে পারিলে সে স্থলে একচন্দ্রজ্ঞান হইবেনা কেন? দ্বিচন্দ্রজ্ঞানটী উহার দ্বারা চাপা পড়িয়া যাইবে না কেন? ভাবনার প্রাবল্যে ভাবনার বিষয় প্রত্যক্ষ হয়, একথা আচার্য্যই স্বয়ং কিছু পরে স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং এ আপত্তি তাঁহার অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িতেছে। আমরা সাধারণতঃও দেখিয়া থাকি, অভ্যাসবশে কৃত কর্ম্ম অনেক সময় আমাদের অজ্ঞাত-সারে সাধিত হয়; এমন কি, কেহ উহা প্রত্যক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেও লোকে কখন কখন তাহা অস্বীকার করে। ইহার দৃষ্টান্ত "পা নাচান," কথার মাত্রা যেমন "বুঝলে কি না," "জান" ইত্যাদি। সুতরাং দ্বিচন্দ্র-জ্ঞান হইলেও, একচন্দ্রজ্ঞানের অভ্যাসের প্রাবল্যে দ্বিচন্দ্রজ্ঞানের অনুবৃত্তি পর্য্যন্ত এক সময়ে চাপা পড়িয়া যায়, অবশ্য অভ্যাসের প্রাবল্য না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিচন্দ্রজ্ঞানটীর অনুবৃত্তি হয়, আর এ অভ্যাস "কর্ম্ম" নহে।

তাহার পর কারণের সত্যতা প্রদর্শন করিয়া জ্ঞানের উৎপত্তি কথন —এ প্রসঙ্গে নিরর্থক; কারণ, কারণ মাত্রই কার্য্য অপেক্ষা সত্য, এবং ভ্রমজ্ঞানই হউক বা যথার্থ জ্ঞানই হউক, সকল স্থলেই জ্ঞানোৎপত্তির একটা কারণ থাকে; সুতরাং "তিমিররোগ সত্য, তাই দ্বিচন্দ্রজ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়" আচার্য্যের একথার কোন সার্থকতা নাই। যে কোন জ্ঞানটী যে পরিমাণে দৃঢ় বা বদ্ধমূল থাকে, তাহার বাধকজ্ঞান সেই পরিমাণ দৃঢ় বা বদ্ধমূল হইলে, বাধ্য জ্ঞানটী নষ্ট হইতে বাধ্য, এবং যতক্ষণ সমান দৃঢ় বা বদ্ধমূল না হয়, ততক্ষণ তাহার অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং এই কথার ভিতর আচার্য্য যে কোথায় খণ্ডনের বিষয় পাইলেন, অদ্বৈতবাদী বলেন, তাহা আমরা বুঝি না।

এইবার আচার্য্যের এই প্রসঙ্গে শেষ কথা। যথা—

অপি চ ভেদবাসনা-নিরসনদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিমভ্যুপগচ্ছতাং কদাচিদপি জ্ঞানোৎপত্তি র্ন সেৎস্যতি, ভেদবাসনায়া অনাদিকালোপচিতত্বেনাপরিমিতত্বাৎ তদ্বিরুদ্ধভাবনায়াশ্চাল্পত্বাদনয়া তন্নিরাসানুপপত্তেঃ। অতো বাক্যার্থজ্ঞানাদন্যদেব ধ্যানোপাসনাদিশব্দবাচ্যজ্ঞানং বেদান্তবাক্যৈর্বিধিৎসিতম্ ॥ ১৮ ॥

অর্থাৎ—"আর এক কথা, যাঁহারা ভেদবাসনা অপনয়নের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি ইচ্ছা করেন,তাঁহাদের মতে কথনও জ্ঞানোৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ,ভেদবাসনা অনন্তকালসঞ্চিত,সুতরাং অপরিমিত; আর, তাহার বিপক্ষ জ্ঞানবাসনা (অল্পকালের বলিয়াই) অল্প, সুতরাং তাহা দ্বারা সেই (প্রবল) ভেদবাসনার নিরাস হইতে পারে না, অতএব নিশ্চয়ই ধ্যান ও উপাসনাদি-শব্দগম্য জ্ঞানই সমস্ত বেদান্তবাক্যের বিধিৎসিত,অর্থাৎ বিধান করিতে অভীপ্সিত অর্থ—বাক্যার্থ নহে"। প্রত্যুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন যে, ভেদবাসনার অনাদিত্ব আমরা স্বীকার করি না। আমরা সত্য ব্রহ্ম এবং মিথ্যা অবিদ্যার অনাদিত্ব স্বীকার করি। কারণ, ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, ভেদজ্ঞানের ব্যবহারে ভেদসংস্কার জন্মে। সুতরাং আচার্য্য কি করিয়া এস্থলে একথা লইয়া আমাদের মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন? অবশ্য ভেদবাসনাকে অবিদ্যা বলিলে, উহাকেও অনাদি বলা যাইতে পারিত। কিন্তু ভেদবাসনা ও অবিদ্যা যে এক, একথা আমরা বলি না। তাহার পর "সুদীর্ঘকালসঞ্চিত ভেদবাসনা অল্পকালের জ্ঞানবাসনার নাশ্য হইতে পারে না" আচার্য্যের একথায় আমাদের মতের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ইহার উত্তর পরে দিতেছি।

আর যদি আচার্য্যের কথা মানিয়া লইয়া ভেদবাসনাকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে বলিব যে, ভেদসংস্কার যদি অনাদি হইতে পারে, তবে জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রবৃত্তিটীও কি অনাদি হইতে পারে না? আমরা না হয় বলিব, উভয় সংস্কারের যুদ্ধ চলিতে চলিতে যে জন্মে ভেদসংস্কার পরাভূত হয়, সেই জন্মেই জ্ঞান পূর্ণ হইল, উক্ত জ্ঞানবিকাশের কারণ কর্ম্ম নহে, উহা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ জ্ঞানানুষ্ঠান। তুলার স্তূপে অগ্নিকণা পতিত হইয়া বহু বিলম্বে যদি তাহা তূলাস্তূপকে প্রজ্বলিত

করে, তাহা হইলে কি তাহাতে পুনঃ অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে বলিতে হইবে? কিম্বা, যদি ভেদসংস্কার অনাদিই হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানটী অল্প-দিনের সম্পত্তি হয়, তাহাতেই বা দোষ কি? ভেদসংস্কার মিথ্যা বলিয়া সাদি সত্য তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাধিত হইতে বাধা কি? যদি বলা হয়—অনাদিকে সাদি কেমন করিয়া বিনষ্ট করিবে? তাহা হইলে বলিব—উহা যে, কোন স্থলেই করিতে পারিবে না, এমন নিয়ম আচার্য্য কোথায় পাইয়াছেন? আমাদের দৃষ্টান্ত এজন্য জ্ঞান ও অজ্ঞান। আচার্য্য ইহা অনুভব করুন, করিয়া বলুন, অনাদি অজ্ঞান সাদি জ্ঞানের নাশ্য কি না? যাহা প্রত্যক্ষীকৃত সত্য, তাহাকে শত অনুমান হটাইতে পারে না।

ফলতঃ দেখা যাইতেছে, আচার্য্য রামানুজ অশেষগুণালঙ্কৃত সুবুদ্ধি-মান্ এবং ঈশ্বরশক্তিসমন্বিত হইলেও, তিনি আমাদের অদ্বৈতবাদের বিপক্ষে বৃথা প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি নিজ মত বর্ণন করিয়া লোককে ভগবদ্দাস্যে নিয়োজিত করুন, উপাসনা-পদবাচ্য জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সমুচ্চয় সঙ্গত বলিয়া প্রচার করুন। কারণ, শ্রুতিমধ্যে কোন কোন স্থলে উপাসনাকে জ্ঞান বলা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই, প্রত্যুত আমরা তাহাতে উৎসাহই প্রদান করিব; কিন্তু তিনি বস্তুজ্ঞানরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত উপাসনা-পদবাচ্য জ্ঞান বা কর্ম্মের সমুচ্চয়-প্রচারে প্রবৃত্ত হইলে এবং তজ্জন্য অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া সার সত্যের অপলাপে প্রয়াসী হইলে, অগত্যা আমাদিগকে সেই সত্যরক্ষার্থ আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে।

এইরূপে অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদসংক্রান্ত আচার্য্য রামানুজের অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। বারান্তরে এই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদের সপক্ষে আচার্য্যগৃহীত শ্রুতিপ্রমাণ প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

উদ্বোধন।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।)

জাগো উদ্বোধন-মন্ত্রে, প্রাণ,
মোহের রজনী অবসান!
শোন কি গম্ভীর স্বর উঠে ভরি চরাচর,
উঠে ভরি অসীম বিমান।
শোন সে অমৃত বাণী,— যে বাণী বহিয়া আনি
পবন জীবন করে দান।
শোন সেই সিন্ধুরব,— প্রাণ যাহে পায় শব,
মূর্চ্ছিত ফিরিয়া পায় জ্ঞান।
শোন সেই বজ্রনাদ, যাহে দৃঢ় শিলাবাঁধ
চূর্ণ হ'য়ে হয় শতখান,—
কারামুক্ত নেত্র আগে তরুণ অরুণ জাগে,
অন্ধ নিশা হয় অবসান!
জাগো, সেই মন্ত্রে জাগো প্রাণ!

"বাসনা স্বপনে হায়! র'বে কি শবের প্রায়?
"জাগো আজি ,জাগো মহাপ্রাণ!
"মৃত্যুরে বরণ করি অমৃতের অধিকারি,
"রহিবে কি শ্মশানে শয়ান?
"এই দেহ, এই গেহ, পুত্র পরিজনে স্নেহ,
"ভোগসুখ, সম্পদ, সম্মান,
"এই জয় পরাজয়, এই যে উদয়, লয়,
"সুখ, দুঃখ, মান, অপমান,—
"রচিয়া এ তন্তুজাল ঊর্ণনাভ, চিরকাল
"আপনারে বাঁধিছ কেবল,

"বাসনা-প্রাচীর দিয়া অন্ধকূপ নিরমিয়া,
"নিজে গড়ি পরিছ শৃঙ্খল !
"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"
এই উদ্বোধন-মন্ত্রে নিদ্রাজয়ী হে সন্ন্যাসি
জাগাও এ নিদ্রিত ভারত !
ঈশানের করধৃত প্রলয় পিনাক-নাদে
জগমায়া ঘুচিল যেমন,
তোমার বিষাণ-রবে তেমনি বিলয় হবে
ভারতের মোহের স্বপন !

"জাগো আজি, জাগো বীর্য্যবান্ !
"মায়ার রজনী অবসান !
"খোল আঁখি, হের আগে দীপ্তিময় রবি জাগে,
"জ্যোতিঃ-রাগে উজ্জ্বল বিমান।
"সংসারের সুখ দুঃখ ! উদ্বেগে আকুল বুক,
"প্রতিপদে চকিত শঙ্কায়—
রজ্জুতে সর্পের ভান তাহে সন্ত্রাসিত প্রাণ,—
"এ কভু তোমারে শোভা পায় ?
"স্বপন-সাগর-পারে সাঁতারি যেতে কি পারে
"নিদ্রাঘোরে অবশ যে জন ?
"বারেক মেলিলে আঁখি মিলাবে সংসার ফাঁকি
"মায়ার এ মরীচি সৃজন।
"তোল অবনত শির, উঠ আত্মজয়ী বীর,
"ভাঙ্গ দৃঢ় বাসনা-শৃঙ্খল !
"আপনারে লও জিনি আপনারে লও চিনি
"লও কিনি আপন সম্বল।
"উত্তিষ্ঠত জাগত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

এই উদ্বোধন-মন্ত্রে নিদ্রাজয়ী হে সন্ন্যাসি,
জাগাও এ নিদ্রিত ভারত!
ঈশানের করধৃত প্রলয়-পিনাক-নাদে
জগমায়া ঘুচিল যেমন,
তোমার বিষাণ-রবে তেমনি বিলয় হবে
ভারতের মোহের স্বপন।

"জাগো জাগো কল্যাণরূপিণি,
"মৃত্যুঞ্জিতা বীরপ্রসবিনি!
"এখনো বালিকা হ'য়ে খেলিস্ খেলানা ল'য়ে,
"একি ভাব তোমার জননি!
"মা, তোরে দেখেছি আগে ভূষিতা ভস্মের রাগে,
"উদাসিনী সর্ব্ব-তেয়াগিনী,
"মা, তোরে দেখেছি আগে ত্যাগ-অলক্তক-রাগে
শক্তিময়ী দেবতা-জননী।
"দেখিয়াছি হাসি-মুখে চিতায় অনল-বুকে
"দেহ-দান দিতে আপনার;
"সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্বময়ী— সর্ব্বস্বরূপিণি অয়ি,
"কতরূপ দেখেছি তোমার!
"কখনো জননী হ'য়ে নীলমণি কোলে লয়ে,
"স্নেহময়ী করুণা-নিলয়া,
"কখনো দীনের দ্বারে অন্নপূর্ণা একেবারে,
"যেন তুমি মূর্ত্তিমতী দয়া।
"পতি পুত্র পরিজন প্রতিবাসী দীনজন
"সুজন দুর্জ্জন যেবা আছে,
"মা, তোমার স্নেহ আশে যে তোমার পাশে আসে,
"কে কবে বঞ্চিত তোর কাছে?
"দিয়াছ আপনা ঢালি সর্ব্বময়-পদে ডালি,
দানের কি আছে তোর সীমা?

"যেবা চায় তারে দাও, প্রতিদান নাহি চাও,
"জান না মা আপন মহিমা।
"জগত কল্যাণ আশে কভু মুক্ত কেশপাশে
"অপরূপ রূপ মা তোমার,
"কত রূপ নাহি সীমা! সুন্দরে জড়িতা ভীমা,
"নয়নে দেখেছি কতবার!
"কভু ভীমমাতা হ'য়ে নিজ প্রাণ-পুত্র ল'য়ে,
"ধরি দাও অসুরের মুখে,
"কখনো অর্জ্জুন-রথে সুভদ্রা সারথি তুমি
ত্যজি ভয় পরম কৌতুকে!
"—আজি এ কি খেলা তোর? তোর চক্ষে মায়া-ঘোর!
"অচেতনা চৈতন্যরূপিণী!
"আপনা ভুলিয়া আজ একি বেশ, একি সাজ
"ধরেছিস্ জগ-প্রসবিনি!
"তোর এ কি ভ্রান্তি মাগো! জাগো মা আবার জাগো,
"জাগো, জাগো, নিখিল কল্যাণে,
"জাগো, জাগো আত্ম-বিসর্জ্জনে!
"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"
এই উদ্বোধন-মন্ত্রে আত্মত্যাগী হে সন্ন্যাসি,
জাগাও এ নিদ্রিত ভারত!
ঈশানের করধৃত প্রলয়-পিনাক-নাদে
জগমায়া ঘুচিল যেমন,
তোমার বিষাণ-রবে তেমনি বিলয় হবে
ভারতের মোহের স্বপন!

জাগো উদ্বোধন-মন্ত্রে, প্রাণ!
মোহের রজনী অবসান!

"কে পীড়িত শয্যাতলে, কে শোকার্ত্ত অশ্রুজলে
"নিয়ত মরণ কর ধ্যান ?
"কে মত্ত সম্পদ-মদে ? কে দলিত রিপু-পদে ?
"কে করিছ আত্ম-অপমান ?
"ভয়ার্ত্ত কে মৃত্যু-ভয়ে ? হিংসা কালফণী ল'য়ে—
"কে পুষিছ হৃদে আপনার ?
"তৃণ যেন স্রোতোমুখে,— খ্যাতি নিন্দা সুখে দুঃখে
"ভেসে কে যেতেছ বারবার ?
"এই সুখ-দুঃখ-মালা বিষয়-বিষের জ্বালা,—
"অস্তিত্ব কোথায় বল তার ?
"হে আত্মা, আনন্দময়, এ কভু সম্ভব হয়—
"মুক্ত তুমি, বন্ধন তোমার ?
"চৈতন্য কি অচেতন ? কলঙ্কিত নিরঞ্জন ?
"নিত্যের কি আছে মৃত্যুভয় ?
"মেল আঁখি একবার, এ কুহেলি অন্ধকার
"নয়ন-নিমেষে পাবে লয়।
"শুধু এক আনন্দ পাথার,
"সেই এক প্রেম-পারাবার।
"নাহিক মায়ার বেলা ঊর্ম্মি নাহি করে খেলা
"নিস্তরঙ্গ মহাপারাবার !
"জন্ম মৃত্যু দেহ গেহ, কিছু নাই, নাই কেহ,
"এক শুধু কিছু নাই আর !
"জাগো সেই আত্মবোধরূপে,
"জাগো জাগো আপন স্বরূপে !"

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"
এই উদ্বোধন-মন্ত্রে মোহজয়ী হে সন্ন্যাসি
জাগাও এ নিদ্রিত ভারত !

ঈশানের করধৃত প্রলয়-পিনাক-নাদে
জগমায়া ঘুচিল যেমন,
তোমার বিষাণরবে তেমনি বিলয় হবে
ভারতের মোহের স্বপন।

কাশীর পথে শঙ্কর।

যোগিবর শঙ্কর আজ কাশীর পথের পথিক। সঙ্গে তাঁহার কতিপয় সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসিগণ গোবিন্দপাদের আদেশে তাঁহার অদর্শনের পর হইতে শঙ্করকেই আশ্রয় করিয়াছেন। তাই তাঁহারা কাশীর পথে আজ শঙ্করের অনুগমন করিতেছেন।

কাশীযাত্রী এই সন্ন্যাসীদের দৃশ্যটী অতি সুন্দর হইয়াছে। সকলেরই মস্তক মুণ্ডিত, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র, পরিধানে গৈরিক বসন, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা। এক হস্তে দণ্ড, অপর হস্তে কমণ্ডলু, কক্ষদেশে কুশাসন ও মৃগচর্ম্ম অথবা ব্যাঘ্রচর্ম্ম রক্ষিত। মস্তক এবং পদদ্বয় সকলেরই অনাবৃত। সকলে একটী বালক সন্ন্যাসীকে অগ্রগামী করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছেন।

এ সময় যোগিবর শঙ্করের অবস্থা বড়ই মনোহর। তিনি যেন আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহাতে চপলতার লেশ নাই। তাঁহার সেই সৌম্যমূর্ত্তিতে গাম্ভীর্য্যের পূর্ণবিকাশ। পথ ভ্রমণে ক্লান্তি বা বিরক্তি নাই, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনি কাতর হন না, বিশ্রাম বা আহারাদির জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই। শিষ্যগণের অনুরোধেই প্রায় দিনান্তে একবার যৎসামান্য ফল মূল, অথবা কখন পল্লীবাসীর প্রদত্ত আহারীয় দ্রব্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন মাত্র। চলিতে চলিতে যখন কোন শিষ্য ক্লান্ত হইয়া যোগিবরের নিকট বিশ্রামের জন্য প্রস্তাব করেন, তখনই তিনি বিশ্রাম করেন। সন্ধ্যাসমাগমে কোনও দেবালয় অথবা বৃক্ষমূলে তাঁহারা নিশা যাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, যোগী শঙ্কর তথায় সে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া থাকেন। রাত্রে সামান্য নিদ্রা যান, কখন বা আত্মচিন্তনে নিশি অতিবাহিত করেন। পথিমধ্যে কতই অরণ্যজাত বিবিধ অভিনব

পদার্থ তাঁহার বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে বা দূরে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, যোগীশ্বরের কিন্তু কোনও দিকে দৃষ্টি নাই, তাঁহার পদ্মপলাশসদৃশ নয়ন যেন অর্দ্ধ-নিমীলিতভাবে কেবলমাত্র সম্মুখস্থ অনন্তের শোভা-সাগরে নিমগ্ন। তাঁহার এই আনন্দময় সৌম্যমূর্ত্তি যে দেখে, সে যেন মনে মনে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে থাকে। কেহই তাঁহাকে ভক্তি বা স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিতে সাহসী হয় না, যেহেতু যোগিবরের গাম্ভীর্য্যই এস্থলে অন্তরায় হইয়া উঠে। সন্ন্যাসিগণের অবস্থাও শঙ্করের আদর্শে কতকটা যেন শঙ্করের মতই হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তথাপি গোবিন্দপাদের অদর্শনজনিত শোক এখনও তাঁহাদের হৃদয়কন্দর পরিত্যাগ করে নাই; তাঁহারা মধ্যে মধ্যে কাশীপতি বিশ্বেশ্বরের দর্শন পাইবার আশায় অথবা যোগীশ্বর শঙ্করের আশ্রয় লাভে উৎফুল্ল হন, আবার কখন বা সন্ন্যাস-আশ্রমের কঠোরতা অনুভব করিয়া, হতাশার অবসাদে অবসন্ন হন। তাঁহারা এই সুদীর্ঘ পথের অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিতে না করিতে যেন নিতান্ত পরিশ্রান্ত এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। অবশ্য এরূপ না হওয়াই বিচিত্র, কারণ, একে তাঁহাদিগের বয়সাধিক্য, তাহাতে তাঁহারা গোবিন্দপাদের সমাধিভঙ্গের আশায় বহুকাল ধরিয়া গুহামধ্যে বাস করিয়া ভ্রমণে একেবারেই অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যেন নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন, কেহ বা নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া গোবিন্দপাদের আদেশ স্মরণ করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন।

বিচক্ষণ শঙ্কর শিষ্যগণের এই অবস্থা বুঝিলেন। তিনি নানা উপদেশপূর্ণ কথায় তাঁহাদিগের চিত্তরঞ্জন করিতে লাগিলেন। কখন বা তিনি তাঁহাদের নিকট যোগের গুহ্য রহস্য, কখন বা কাশীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন। এইরূপে তিনি এক দিন শাস্ত্রোক্ত কাশীমাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া একটী সুন্দর কাশীস্তোত্র রচনা করিলেন এবং শিষ্যদিগকে শুনাইলেন। কাশীর পথে এই স্তোত্রটী শিষ্যদিগের বড়ই মধুর লাগিয়াছিল। তাঁহারা পথ চলিবার সময় মধ্যে মধ্যে এই স্তোত্রটী সমস্বরে গান করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। স্তোত্রটী এই ;—

মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ১
জরয়া পরিভূতা যে যে ব্যাধিকবলীকৃতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ২
পদে পদে সমাক্রান্তা যে বিপদ্‌ভিরহর্নিশম্।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৩
পাপরাশি-সমাক্রান্তা যে দারিদ্র-পরাজিতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৪
সংসার-ভয়ভীতা যে যে বদ্ধাঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৫
শ্রুতিস্মৃতিবিহীনা যে শৌচাচার-বিবর্জ্জিতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৬
যে চ যোগপরিভ্রষ্টাস্তপোদানবিবর্জ্জিতাঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৭
মধ্যে বন্ধুজনং যেষামপমানঃ পদে পদে।
আনন্দবর্দ্ধকং তেষাং শম্ভোরানন্দকাননম্ ॥ ৮
আনন্দকাননে যেষাং সততং বসতিঃ সতাম্।
বিশেষানুগৃহীতানাং তেষামানন্দনোদয়ঃ ॥ ৯

অর্থাৎ যাহারা পিতামাতা এবং নিজ বন্ধুজনদ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে, যাহাদিগের কোথাও গতি নাই, তাহাদিগের বারাণসীই গতি।

যাহারা বার্দ্ধক্যের দ্বারা অভিভূত, যাহারা ব্যাধির কবলে পতিত, যাহাদিগের কোথায়ও গতি নাই, তাহাদিগের বারাণসীই গতি।

যাহারা বিপদের দ্বারা পদে পদে অহর্নিশি আক্রান্ত, যাহাদিগের কোথাও গতি নাই, তাহাদিগের বারাণসীই গতি।

যাহারা পাপরাশিতে আক্রান্ত, দরিদ্রতা যাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছে, যাহাদিগের কোথাও গতি নাই, তাহাদিগের বারাণসীই গতি।

যাহারা সংসারভয়ে ভীত, যাহারা কর্ম্মরূপ বন্ধনে আবদ্ধ, যাহাদিগের কোথায়ও গতি নাই, তাহাদিগের বারাণসীই গতি।

যাহারা শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র-বিহীন এবং শুদ্ধাচারবর্জ্জিত, যাহাদিগের কোথায়ও গতি নাই, তাহাদিগের বারাণসীই গতি।

যাহারা যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং তপস্যা ও দানধর্ম্মে বর্জ্জিত, যাহাদিগের কোথায়ও গতি নাই, তাহাদিগের বারাণসীই গতি।

বন্ধুগণ মধ্যে যাহাদিগের পদে পদে অপমান হয়, শম্ভুর আনন্দ-কানন কাশী তাহাদিগের আনন্দবর্দ্ধক।

যে সাধুগণ সর্ব্বদা আনন্দ-কাননে বাস করে, তাহারা (ঈশ্বরের) বিশেষ অনুগৃহীত, তাহাদিগের আনন্দ উদয় নিশ্চয়ই হইবে।

পথিমধ্যে এই কাশীমাহাত্ম্যটী গান করিয়া শিষ্যগণ এখন হইতে পথক্লেশে আর তত পরিশ্রান্ত বোধ করিলেন না। তাঁহারা নব উৎসাহে অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিলেন। এইরূপে সশিষ্য শঙ্কর কাশীর প্রায় অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিলেন। কাশীর পথ বড় অল্প নহে। আবার ওঙ্কারনাথ হইতে বারাণসী যাইতে হইলে লোকে সাধারণতঃ উজ্জয়িনী হইয়া সাঞ্চি ও প্রয়াগের ভিতর দিয়া গমন করে। এজন্য ইহার দূরত্ব আরও দীর্ঘ হইয়া উঠে। যোগিবর শঙ্কর অবশ্য এ পথে গমন করিতেছেন না, তিনি একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পরামর্শ-মত নর্ম্মদার তীর ধরিয়া কিছুদূর পূর্ব্বমুখে আসিয়া, প্রাচীন হৈহয় রাজ্যের মধ্য দিয়া উত্তর মুখে কাশীর পথ ধরিয়াছেন। ইহা সর্ব্বপরিচিত প্রসিদ্ধ পথ নহে। কারণ, হৈহয় রাজ্য অনেক দিন হইতে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে এবং বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাবে উজ্জয়িনীর পথই এসময় প্রসিদ্ধ পথে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এ পথে প্রধান প্রধান নগর অথবা বড় বড় গ্রাম প্রায় নাই। এই হেতু, যদিও তদবলম্বিত পথ অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব, তথাপি উহা কঠিনতর পথ, কারণ, এ পথে কখন দুর্গম পার্ব্বত্য ভূমির মধ্য দিয়া, কখন বা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার পথের ন্যায় পথ ধরিয়া যাইতে হয়। এ পথে মনুষ্য-শিল্পি-রচিত শিল্পসমূহের কৃত্রিম শোভার পরিবর্ত্তে, বিশ্ব-শিল্পীর সৃষ্ট প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই অধিক। কিন্তু নির্দ্দয় পথ-ক্লেশ সন্ন্যাসী-দিগের এই শোভা সম্ভোগের শক্তি অপহরণ করিল। তাঁহারা অল্পদিনের পরই আর এ শোভা দেখিয়া মোহিত হইলেন না, এবং কাশীস্তোত্র

গান করিয়াও আর সুখ পাইলেন না। শঙ্কর শিষ্যগণের অবস্থা বুঝিলেন এবং এইবার সন্ন্যাসীর সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া একটি মধুর কবিতা রচনা করিলেন। আচার্য্যমুখে সন্ন্যাসিগণ এই কবিতা শ্রবণ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। হইবারই কথা, কারণ, ইহা ত কবির কল্পনা নহে, বুদ্ধিমানের বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শনও নহে, ইহা আদর্শ সন্ন্যাসীর মুখে আদর্শ সন্ন্যাসীর লক্ষণ বর্ণন। ইহা শুনিয়া কাহার না শরীর মন পুলকিত হয়? তাঁহারা আচার্য্যমুখে এই কবিতা শুনিয়া যথার্থই নবজীবন পাইলেন, এবং পথ চলিবার সময় এই কবিতাটী গান করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। আচার্য্যরচিত সন্ন্যাসীদিগের সৌভাগ্যবর্ণনসূচক সে কবিতাটী এই:—

"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ১
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ২
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৩
দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ স্বাত্মানমাত্মনবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৪
ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥" ৫

যাঁহারা বেদান্ত-বাক্যেতেই সর্ব্বদা নিমগ্ন এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারাই সন্তুষ্ট হইয়া শোকবিহীন অন্তরে বিচরণ করেন, সেই কৌপীনবান্ সন্ন্যাসিগণই ভাগ্যবান্।

একমাত্র বৃক্ষমূলই যাঁহাদের আশ্রয়, যাঁহাদের হস্তদ্বয় কেবল ভোজ্যবস্তু আহরণের জন্য নহে, ছিন্ন কন্থার ন্যায় যাঁহারা ধন ঐশ্বর্য্যের নিন্দা করেন, কৌপীনবান্ সেই সন্ন্যাসিগণই ভাগ্যবান্।

যাঁহারা নিজানন্দে পরিতুষ্ট, যাঁহাদের সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি সম্পূর্ণ শান্ত হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা দিবারাত্রি পরমব্রহ্মেতে নিমগ্ন, কৌপীনবান্ সেই সন্ন্যাসিগণই ভাগ্যবান্।

যাঁহারা দেহাদিভাব অতিক্রম করিয়াছেন, যাঁহারা নিজ আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিয়া থাকেন, যাঁহারা আদি অন্ত ও বহির্দ্দেশ জ্ঞানবিহীন, কৌপীনবান্ সেই সন্ন্যাসিগণই ভাগ্যবান্।

যাঁহারা পবিত্র প্রণব উচ্চারণে নিযুক্ত, 'আমি ব্রহ্ম' এই ভাবনায় নিমগ্ন এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আহার করিয়া চারিদিক্ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, সেই কৌপীনবান্ সন্ন্যাসিগণই ভাগ্যবান্।

ইহাই সেই আচার্য্য শঙ্কর-রচিত প্রসিদ্ধ কৌপীনপঞ্চকম্। সন্ন্যাসি-গণ এই মহাভাবযুক্ত শ্রুতিমধুর কবিতা গান করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, তাঁহারা এখন হইতে মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কাশীস্তোত্র এবং প্রায়ই এই কৌপীনপঞ্চক গান করিতে করিতে কাশীর পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীমতী——

কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম।

কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের একাদশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উহার বর্ত্তমান কয়েকটী অভাবের দিকে সহৃদয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। যাহাতে আশ্রম আরও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়, তজ্জন্য ইহার ভিতর আরও অন্ততঃ তিনটী ওয়ার্ডের প্রয়োজন। ১ম, গৃহস্থ রোগিগণের জন্য একটী পৃথক্ হাঁসপাতাল, ২য়, কলেরা রোগীর পৃথক ওয়ার্ড এবং ৩য়, অন্যান্য সংক্রামক রোগিগণের জন্য পৃথক্ ওয়ার্ড।

১ম—এপর্য্যন্ত আশ্রমের হাঁসপাতালে প্রধানতঃ সাধুগণই আশ্রয় পাইয়াছেন। কারণ, হরিদ্বার কনখলের ন্যায় সাধুপ্রধান স্থানে সাধুরোগীর সংখ্যাই অধিক—ইঁহারা আবার একেবারে নিঃসম্বল। আর সেই জন্যই সাধুগণের চিকিৎসা করাই প্রথম হইতে এই আশ্রমের একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কার্য্য যতই বাড়িতেছে, ততই দেখা যাইতেছে, দরিদ্র গৃহস্থ তীর্থযাত্রী এবং স্থানীয় অধিবাসিগণেরও আশ্রমে থাকিয়া চিকিৎসিত হইবার দাবী আর উপেক্ষা করা চলে না। অনেক গৃহস্থ আশ্রমের হাঁসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসার্থ

আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য পৃথক্ হাঁসপাতাল-বাটীর অভাবে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ফেরত দিতে হইতেছে। কারণ, বর্ত্তমান হাঁসপাতালটীতে ৮টীর অধিক স্থান নাই এবং উহাও প্রায় সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে। আর এক কথা, লোকের ধর্ম্মসংস্কারে বাধা প্রদান না করিয়া সেবা করাই আশ্রমের উদ্দেশ্য, কিন্তু গৃহিগণকে সাধুগণের সহিত এক হাঁসপাতালে রাখিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এই কারণেই গৃহস্থদের জন্য একটী পৃথক্ হাঁসপাতালের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। উহার সম্ভাবিত ব্যয়—৫০০০৲ টাকা।

২য়—চিকিৎসা ও শুশ্রূষাপ্রার্থী কলেরা রোগীর সংখ্যাও বড় কম নহে। বিশেষতঃ মেলা প্রভৃতির সময় এই সংখ্যা অতিরিক্ত বাড়িয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগকেও বর্ত্তমান হাঁসপাতালে অন্যান্য রোগীর সহিত রাখিতে পারা যায় না, স্নতরাং অধিকাংশ সময়ে তাঁহাদিগকে ঔষধ পথ্য দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে এমন হয় যে, তাঁহাদিগকে আশ্রয় না দিলে আর চলে না, তখন তাঁহাদের জন্য পৃথক্ অস্থায়ী কুটীর বাঁধিয়া কাজ চালাইতে হয়, স্নতরাং ইহারও বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সম্ভাবিত ব্যয়—৩০০০৲ টাকা।

৩য়—এতদ্ব্যতীত প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি অন্যান্য সংক্রামক রোগীও অনেক সময় আসিয়া থাকে; তাহাদের জন্যও একটা স্বতন্ত্র ওয়ার্ড করিয়া রাখিলে কার্য্যের বিশেষ স্নবিধা হয়। সম্ভাবিত ব্যয়—৩০০০৲ টাকা।

আর এক কথা, এক্ষণেই প্রতি মাসে আশ্রমে প্রায় ২০০৲ টাকার উপর খরচ হইতেছে। সম্প্রতি নির্ম্মিত ক্ষয়রোগ-চিকিৎসালয়ে রোগী লওয়া আরম্ভ হইলে, এই খরচ অন্ততঃ দেড় গুণ বাড়িয়া যাইবে। অথচ আশ্রম-তহবিলে মাত্র ৫৮৪।৫ জমা এবং আশ্রমের কার্য্য প্রধানতঃ এককালীন দাতাগণের অনিশ্চিত দানের উপর নির্ভর করিতেছে। স্নতরাং দেখা যাইতেছে, আশ্রমের কার্য্য স্থায়িভাবে চালাইতে গেলে, প্রথমতঃ নিয়মিত মাসিক চাঁদাদাতৃগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া প্রয়োজন এবং তৎপরে আশ্রমের স্থায়ী তহবিলের চেষ্টা হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

অনেকে হরিদ্বারের ন্যায় তীর্থস্থানে নিজ নিজ প্রিয় আত্মীয় স্বজনের

স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে, এই-বার তাঁহাদের অতি শুভ অবসর উপস্থিত। যে তিনটী বাটী নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে, যদি কেহ তাহার এক একটীর সমুদয় ব্যয় প্রদান করেন, তবে তাহাদের এক এক জনের নামেই ঐরূপ স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইতে পারে। অথবা কেহ ইচ্ছা করিলে, উক্ত বাটীগুলির এক একটী ঘরের ব্যয়-স্বরূপ ১০০০৲ টাকা দিলেও কেবল উক্ত ঘরটী তাঁহার আত্মীয়ের স্মৃতিমন্দিররূপে উৎসর্গীকৃত হইতে পারে। আর যাঁহারা এক একটী রোগীর সমুদয় খরচ দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে ঐ হিসাবে মাসিক দশ টাকা করিয়া দিলেই চলিবে, অথবা ৪০০০৲ টাকার স্থায়ী ফণ্ড করিয়া দিলে তাহার সুদ হইতে উক্ত রোগীর ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। এতদ্ব্যতীত গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অথবা আশ্রমের সাধারণ খরচের জন্য যিনি যাহা কিছু দিবেন, তাহাই ধন্যবাদ-সহকারে গৃহীত হইবে। টাকা কড়ি (১) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় পোঃ (হাওড়া) অথবা (২) স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল পোঃ, (সাহারানপুর) (৩) বা কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, ১২ ও ১৩ গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা।

এই তিনটী ঠিকানার যে কোনটীতে পাঠাইলেই চলিবে।

উপসংহারে বক্তব্য, এই রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম যে কার্য্য করিতেছেন, উহা বাস্তবিক এক বিরাট্ জাতীয় যজ্ঞ-স্বরূপ। সেবকগণ ইহার পরিচারক মাত্র। পূজা—সর্ব্বসাধারণের; সুতরাং তাহার সাফল্য বা বৈফল্যের দোষ-গুণও তাঁহাদেরই। আজ তাঁহাদের নিকট, বিশেষতঃ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট আমরা ইহার কয়েকটী অভাবের কথা জানাইলাম। আশা করি, তাঁহাদের সহযোগিতায় আমরা উত্তরোত্তর এই পূজা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইব। বিশেষ, স্মরণ রাখা উচিত—কাজটী বাঙ্গালীর। বাঙ্গালা দেশ হইতে বহুদূরে এই কার্য্যের দ্বারা ভারতীয় অন্যান্য জাতির নিকট বাঙ্গালীর গৌরব বাড়িয়াছে,—সেই গৌরব অক্ষুন্ন ও স্থায়ী করিবার চেষ্টা কি বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য নহে?

যাঁহারা সৎকার্য্য মাত্রেই দান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলা বাহুল্য। কিন্তু যাঁহারা এটীকে স্থানীয় কার্য্য মনে করিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণেরই ইহাতে সাহায্য করা উচিত মনে করেন, তাঁহাদের জ্ঞাতার্থে বলি, এ কার্য্যকে বাস্তবিক স্থানীয় কার্য্য বলিতে পারা যায় না। কারণ, এটী তীর্থস্থান—এ স্থানে ভারতের সর্ব্বস্থান হইতেই যাত্রিগণ সমবেত হইয়া থাকেন—বিশেষতঃ, রেলের কল্যাণে এই সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পাঠক মহাশয়, ভাবিয়া দেখুন যে, আশ্রমের সূত্রপাত হইতে এ পর্য্যন্ত যে ৫৬৯৭৪ সংখ্যক রোগী এখানে চিকিৎসিত হইয়াছে, এই আশ্রম না থাকিলে, তাহাদের কি ভীষণ অবস্থা হইত। কল্পনাসহায়ে ভাবুন দেখি, আপনার কোন বৃদ্ধ আত্মীয় স্বজন তীর্থগমন করিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন—তাহা হইলেই এই আশ্রমের উপকারিতা আপনার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। আর এই আশ্রমের উপকারিতা বুঝিয়া, দরিদ্র নারায়ণগণের সেবার উদ্দেশে আপনি যাহা কিছু দিবেন, তাহাই কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব।

আগামী ২০শে মাঘ ২রা ফেব্রুয়ারি রবিবার, পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজির একপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব তদীয় শিষ্য ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক বেলুড় ও তাহার শাখা মঠ সমূহে অনুষ্ঠিত হইবে। উৎসবের প্রধান অঙ্গ "দরিদ্র নারায়ণ" গণের সেবাও ঐদিন অনুষ্ঠিত হইবে। আশা করি, উদ্বোধনের পাঠকগণ উহাতে যথাসম্ভব যোগদান করিবেন।

সমালোচনা।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালাভাষায় অনূদিত। প্রকাশক—জি, পি, বসু; শ্যামপুকুর, ২ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

যোগবাশিষ্ঠের প্রথম প্রকরণ ও দ্বিতীয় প্রকরণের কতকাংশমাত্র—

পরলোকগত চন্দ্রনাথ বাবুর জীবদ্দশায় অনূদিত হইয়াছিল। নানা কারণে তিনি আর অধিক প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সুখের বিষয়, তাঁহার পুত্রগণ সেই অসমাপ্ত কার্য্য উৎসাহের সহিত সম্পূর্ণ করিয়া, বেদোক্ত পূরণার্থক পুত্রশব্দের যথার্থ মর্য্যাদা এ ক্ষেত্রে রক্ষা করিয়াছেন।

অনুবাদ উপস্থিতমত ভালই হইয়াছে, নিঃসংশয়ে ইহা বলা যায়। কারণ, অনুবাদের ভাষা আরও সহজ ও সুললিত করিতে পারেন, এরূপ অনুবাদক বঙ্গসাহিত্যে এখনও সুদুর্ল্লভ, অর্থাৎ থাকিলেও এ সব কাজে পাওয়া দায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক অনূদিত শাস্ত্রগ্রন্থ অপেক্ষা আলোচ্য গ্রন্থে যে ভাষার উন্নতি স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু "যোগবাশিষ্ঠে"র মত জ্ঞানযোগ-সম্বন্ধীয় একটী আদরের গ্রন্থ মূলশ্লোকবর্জ্জিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইলে, উহার মূল্য কতটা কমিয়া যায়, তাহা ভাবিবার কথা। মূল শ্লোকগুলি পুস্তকে নিবদ্ধ থাকিলে, গ্রন্থের কলেবর হয় ত আরও সিকিভাগ বাড়িয়া যাইত এবং দরও কাজে কাজেই কিছু বেশী হইত। কিন্তু তথাপি কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য অধিক দিয়া গ্রাহক ও ক্রেতাগণ যাহা ঘরে আনিতেন, তাহার মূল্য যে এক হিসাবে ঢের বেশী ও তাহার স্থায়িত্বও যে অধিক, তাহা সহজেই বুঝান যায়। যাহা হউক, এখন উপায় নাই; তবে অন্ততঃ পরিশিষ্ট নাম দিয়াও যদি মূলগ্রন্থখানি গ্রাহক ও ক্রেতাদের ইচ্ছামত গ্রহণার্থ প্রকাশকগণ প্রস্তুত রাখেন, তাহা হইলে মন্দ হয় না।

অশোক বা প্রিয়দর্শী। শ্রীচারুচন্দ্র বসু প্রণীত, সিটি-বুক সোসাইটী (৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল ব্যাপিয়া ভারতীয় বৌদ্ধযুগসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে গবেষণা চলিতেছে, তাহার সংবাদ ও ফলাফল বঙ্গসাহিত্যের পাঠকের জন্য সর্ব্বদা আহরণ করা সাহিত্য-

সেবীদের একটী কর্ত্তব্যবিশেষ, সন্দেহ নাই। সে কর্ত্তব্য মাসিক-পত্রাদির স্তম্ভে প্রবন্ধ লিখিয়া কথঞ্চিৎ পূরণ করা হইতেছে, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু চারুবাবুকে অজস্র সাধুবাদ করি যে, তিনি সংক্ষেপে, সুললিত ভাষায়, অশোকসম্বন্ধীয় নানা গবেষণাকে পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে একটী প্রকৃত মূল্যবান্ উপহার প্রদান করিয়াছেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় এরূপ উদ্যোগে তাঁহার অগ্রগামী, কিন্তু উভয়ের পুস্তকদ্বয় পাঠ করিলে, স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আলোচ্য পুস্তকখানির যথার্থ প্রয়োজন আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে উদ্ভূত হইয়াছিল; কারণ, আজকালকার তুলনায় স্বর্গীয় সেন মহাশয়ের সম্মুখে যে উপকরণ প্রস্তুত ছিল, তাহা খুবই বিরল।

বৌদ্ধযুগ ও অশোকযুগ-সম্বন্ধে যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য আবিস্কৃত হইতেছে, গ্রন্থকার বেশ দক্ষতার সহিত সে সমস্ত ব্যবহার করিয়া পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারত সিংহল প্রভৃতি দেশের প্রচলিত কাহিনী ও বৌদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিও লেখক মহাশয় যথাসম্ভব অবলম্বন করিয়াছেন। ফলে, আমাদের দেশের স্কুলকলেজে পুস্তকখানি যদি পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়, তবে শিক্ষার্থিগণ বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক গবেষণায় এই পুস্তকসাহায্যে একটা যথাযোগ্য প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে।

কিন্তু বৌদ্ধযুগ আদিতে ও অন্তে (অথবা অশোকযুগ উদয়কালে) ভারতীয় সাধনার ধারার সহিত সর্ব্বাংশে কিরূপ যোগ রক্ষা করিয়াছে, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া না দিলে, ভগবান্ বুদ্ধ অথবা প্রিয়দর্শী অশোকের প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নহে। সে যোগ এখনও সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই; ভারতের সনাতন সাধনার মধ্যে বৌদ্ধ সাধনাকে এখনও আমাদের ঐতিহাসিকগণ সম্যক্‌রূপে অঙ্গীভূত করিতে পারেন নাই। যতদিন না সে কাজ সম্পূর্ণ হইতেছে, ততদিন বাঙ্গালা বুদ্ধচরিত বা অশোকচরিতের মধ্যে একটা অভাব থাকিয়া যাইবেই।

কিন্তু সে অভাব আলোচ্য "অশোক" গ্রন্থের গৌরবহানি করে না; কারণ, উহা কোন স্থলেই গবেষণার গতি রুদ্ধ করিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে নাই,—কোনস্থলেই শেষ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে যায় নাই—কেবল বঙ্গীয় পাঠকদের জন্য গবেষণার এতাবল্লব্ধ ফলাফল লিপিবদ্ধ করিয়াছে। আমরা আশা করি, গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য সফল হইবে, বঙ্গীয় পাঠকবর্গ ইহার উপযুক্ত আদর করিবেন।